দারসে হাদীস

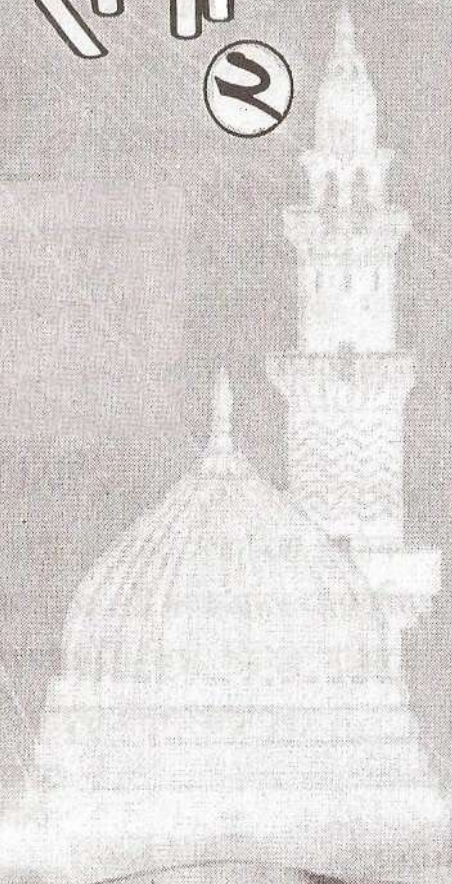
২

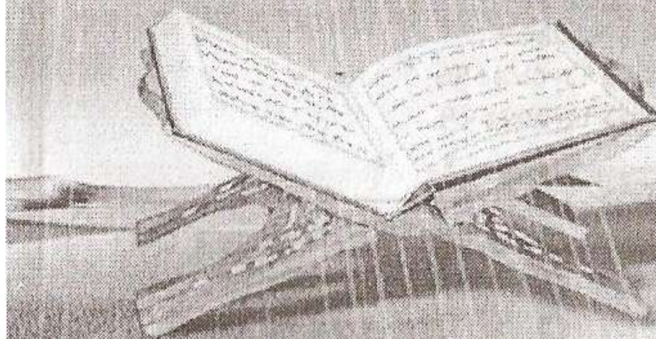


অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মতিন

দারসে হাদীস

২





অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মতিন

প্রকাশনায় ঃ
সাহাল প্রকাশনী
৩০৮/১, খানজাহান আলী রোড,
তারের পুকুর, খুলনা।

প্রকাশ কাল ঃ
শাবান ঃ ১৪২৪ হিজরী
আশ্বিন ১৪১০ সন
অক্টোবর ঃ ২০০৩ সাল

প্রচ্ছদ ঃ অংকুর
স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।

অক্ষর বিন্যাস
মাওঃ মোঃ আল-আমিন
দেশ কম্পিউটার
শামসুর রহমান রোড, খুলনা।

মুদ্রণে ঃ
নবযুগ ছাপাখানা ও প্রকাশনী
২৯৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।
ফোন ঃ ৭২৩৯৬৭ (অনুঃ)

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৩০টাকা

পরিবেশনায় ঃ
সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮/১, খানজাহান আলী রোড
তারের পুকুর, খুলনা।
ফোন ঃ ৭২৩৯৬৭
মোবাইল ঃ ০১৭১-৩৮৯০৭৬,
দোকানঃ ০১৭২-১০২৪২৭

প্রাপ্তিস্থান

- কেন্দ্রীয় জামায়াত প্রকাশনী, ঢাকা।
- জামায়াত প্রকাশনী, ঢাকা মহানগরী।
- জামায়াত প্রকাশনী, সাতক্ষীরা।
- জামায়াত প্রকাশনী, যশোর।
- প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
- আহসান পাবলিকেশন, মগবাজার, ঢাকা।
- একাডেমী লাইব্রেরী দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম।
- তাসনিয়া বই বিতান, মগবাজার, ঢাকা।
- কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
- সখী বিতান, হাতেম খান, রাজশাহী।
- একাডেমী কর্ণার, বিনোদপুর, রাজশাহী।
- আলআমিন লাইব্রেরী, সিলেট।
- কুরআন মহল, সিলেট।
- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য। যাঁর বিশেষ মেহেরবানীতে **দারসে হাদীস দ্বিতীয় খন্ড** প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। বিশিষ্ট লেখক জনাব অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মতিন আল কুরআন এবং আল-হাদীসকে আধুনিক এবং সাধারণ শিক্ষিতদের কাছে সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তারই অংশ হিসেবে দারসে হাদীস **দ্বিতীয় খন্ডের** পান্ডুলিপি তৈরী করেন। আমরা আশা করছি আধুনিক ও সাধারণ শিক্ষিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাই বোনদের জন্য হাদীস নিজে বুঝা এবং অন্যকে বুঝানো সহজ হবে।

ইতোমধ্যে লেখকের লেখা দারসে কুরআন **১ম** ও **২য়** খন্ডসহ আরও **১০**টি বই পাঠক পাঠিকাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। যা আধুনিক এবং সাধারণ শিক্ষিত পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। আমরা আশা করি লেখকের এই লেখার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। লেখকের জন্য আমরা দোআ করি আল্লাহ্পাক যেন তাঁর লেখার হাতকে আরও মজবুত করে দেন এবং আখেরাতে আদালতে নাজাতের অসীলা বানিয়ে দেন।

দারসে হাদীস দ্বিতীয় খন্ড বইটি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সাথে সাথে এই আহবানও জানাচ্ছি যদি কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে সরাসরি কিম্বা পত্রের মাধ্যমে অবহিত করলে আগামীতে সংশোধন করার চেষ্টা করবো ইন্শাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ হাফিজ।
প্রকাশক
তারিখ ঃ ১০ অক্টোবর ২০০৩

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন, অস্‌সালাতু অস্‌সালামু আ'লা সাইয়্যেদিল মুরসালীন, অআ'লা আলেহী আয্‌মায়ীন। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে **দারসে হাদীস দ্বিতীয় খন্ড** প্রকাশ করতে পেরে তাঁরই দরগায় শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা হলো রাসূল (সাঃ)এর হাদীস। সুতরাং কুরআন বুঝতে হলে হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। তাই আমি আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) এর অসংখ্য হাদীস সমূহের মধ্য থেকে বাছাই করে আধুনিক এবং সাধারণ শিক্ষিতদের নিজে বুঝা এবং অপরকে বুঝানোর উপযোগী করে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় হাদীসের দারস লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করি। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহের বাণীতে ইতোমধ্যে দারসে হাদীস প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। যদিও সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে হাদীসের দারস লিখতে ভয় পাচ্ছিলাম। তার পরও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে এই কাজটি আঞ্জাম দেই এবং পরপর ১ম ও ২য় খন্ড লিখা এবং প্রকাশ করতে সক্ষম হই। দারসে হাদীসের আরও খন্ড পরবর্তীতে লেখা এবং প্রকাশিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ্। ইতোমধ্যে আমার লেখা দারসে কুরআন ১ম ও ২য় খন্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং তার আরও খন্ড লেখা হবে ইন্‌শাআল্লাহ্। এই জন্য আমি পাঠক-পাঠিকাদের দোআ এবং আল্লাহ্ পাকের সাহায্য কামনা করছি।

আমি **দারসে হাদীস দ্বিতীয় খন্ড** বইটি আধুনিক এবং সাধারণ শিক্ষিত ইসলামী আন্দোলনের ভাই-বোনদের দারস পেশ করার উপযোগী করে লেখার চেষ্টা করেছি। এই জন্য হাদীস নিজে বুঝা ও অপরকে বুঝানোর জন্য হাদীস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবং হাদীস দারস দানের পদ্ধতি মূল দারস আরম্ভ করার পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাছাড়া হাদীসের সরল অনুবাদের সাথে সাথে শব্দার্থও লিখে দিয়েছি। বইটির আরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো দারসের উপস্থাপনা এমনভাবে করা হয়েছে যেন আপনি নিজেই শ্রোতার সামনে দারস পেশ করছেন।

দারসে হাদীস দ্বিতীয় খন্ড বইটি লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত হীতাকাংখী ভাই ও বোনেরা উৎসাহ, পরামর্শ এবং অর্থ দিয়ে সহযোগীতা করেছেন তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। এজন্য আল্লাহ্‌পাকের কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

লেখা ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এজন্য যদি কোনো সুহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাকে সরাসরি অথবা পত্রের মাধ্যমে অবহিত করার জন্য আহবান জানাচ্ছি। পরবর্তীতে তা সংশোধন করে প্রকাশ করার চেষ্টা করবো ইন্‌শাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ পাকের কাছে আমার আরজি, হে আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তাআলা, তোমার রাসূলের হাদীসের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরতে যেয়ে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি ও বারাবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করে আখেরাতে আদালতে নাজাত দান করিও। আমীন!

মুহাম্মাদ অবদুল মতিন
প্রভাষক, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ, খুলনা।

উৎসর্গ

কবরে চির শায়িত
আমার পরম শ্রদ্ধেয়
মরহুম আব্বা-আম্মা
দাদা-দাদী, নানা-নানী
ও আত্মীয়-স্বজনদের
মাগফিরাত কামনার্থে।

সূচী পত্র

দ্বিতীয় খন্ড

দারসে হাদীস প্রথম খন্ডে যা আছে

এক

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ اِلٰى اَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ- قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهُ اَزْيَنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهِ-قُلْتُ زِدْنِىْ؛ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ- فَاِنَّهُ ذِكْرٌلَكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌلَكَ فِى الْاَرْضِ - قُلْتُ زِدْنِىْ، قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَاِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلٰى اَمْرِ دِيْنِكَ- قُلْتُ زِدْنِىْ، قَالَ وَاِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَاِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيُذْهِبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ- قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا- قُلْتُ زِدْنِىْ، قَالَ لَا تَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ - قُلْتُ زِدْنِىْ؛ قَالَ لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ- (بَيْحَقِى)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর দরবারে হাজির হলাম। অতঃপর তিনি বিস্তারিত ভাবে (ঘটনা) বর্ণনা করলেন। বর্ণনাকালে এটাও উল্লেখ করেন যে, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ), আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, প্রত্যেকটা ব্যাপারে অন্তরে আল্লাহ্র ভয় রাখবে। কেননা ঐ একটা কথা (আল্লাহ্র ভয়) এর কারণে তোমার সমস্ত দ্বীন সৌন্দর্য মন্ডিত হয়ে যাবে।

পুনরায় আমি আরয করলাম, আরো কিছু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ তুমি কুরআন তিলাওয়াত (অধ্যায়ন) এবং আল্লাহ্র যিকির (স্মরণ) করতে থাকো। কেননা এ কাজের জন্য আসমানে তোমার কথা আলোচিত হবে এবং যমীনে তুমি সম্মান লাভ করবে। বললাম, আরো কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ তুমি প্রায়ই চুপ-চাপ অবস্থায় জীবন-যাপন করবে। কেননা এ অভ্যাস শয়তানের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। আর দ্বীনের সব কাজে সহায়তা করে। আমি পুনরায় আরয করলাম, আরো কিছু উপদেশ দিন হে আল্লাহ্র রাসল (সাঃ) বললেনঃ বেশী হাসা-হাসি করো না। কেননা এতে অন্তর মরে যায় এবং চেহারার উজ্জ্বলতা কমে যায়। আরয করলাম, আরো কিছু নসিহত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ তিক্ত হলেও সর্বদা সত্য কথা বলবে। আমি আবার বললাম, আরো কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ্র কাজে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। আমি বললাম, আরো কিছু উপদেশ দিন। বললেনঃ তোমার মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি আছে বলে তুমি মনে কর অন্যের সে দোষ-ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করো না। (বায়হাকী)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ -থেকে বা হতে। قَالَ -বলেন دَخَلْتُ-আমি প্রবেশ করলাম বা উপস্থিত হলাম। فَذَكَرَ -অতঃপর বর্ণনা করেন। الْحَدِيْثَ -ঘটনা প্রবাহ। بِطُوْلِهِ -বিস্তারিত ভাবে। اِلٰى -দিকে। قُلْتُ -আমি আরয করলাম বা বললাম। يَا -হে বা ওহে। اَوْصِنِىْ -আমাকে নসিহত করুন বা উপদেশ দিন। اُوْصِيْكَ -আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। بِتَقْوَى اللّٰهِ -আল্লাহ্র ভয়ের। فَاِنَّهُ -কেননা উহা। اَزْيَنُ -সৌন্দর্যমন্ডিত করে। لِاَمْرِكَ -তোমার (দ্বীনের) কাজকে। كُلِّهِ -উহার প্রত্যেকটি। زِدْنِىْ -আমাকে আরো উপদেশ দিন। عَلَيْكَ -তোমার উপর বা জন্য। تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ -কুরআন তিলাওয়াত বা অধ্যায়ন। وَ -এবং ذِكْرِ اللّٰهِ -আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণ। ذِكْرٌ لَكَ- -তোমার কথা আলোচিত হয়। فِى السَّمَاءِ- -আসমানে। نُوْرٌ لَكَ- -তোমার জন্য সম্মান। فِى

اَلْاَرْضِ –যমীনে বা পৃথিবীতে। بِطُوْلِ الصَّمْتِ- –প্রায়ই চুপ-চাপ থাকবে। مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ –শয়তানকে ঘেঁষতে দেয় না। عَوْنٌ لَكَ –তোমার জন্য সহায়ক হবে। اَمْرِ دِيْنِكَ- –তোমার দ্বীনের সব কাজ। كَثْرَةَ الضِّحْكِ –বেশী বেশী হাসা-হাসি। يُمِيْتُ الْقَلْبَ –অন্তর মরে যায় বা মৃত্যু ঘটে। يُذْهِبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ –চেহারার উজ্জ্বলতা কেড়ে নেয় বা লোপ পায়। قُلِ الْحَقَّ –সত্য বলবে। وَاِنْ كَانَ مُرًّا –যদিও তা তিক্ত বা কটু হয়। لَا تَخَفْ فِى اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র কাজে ভয় বা ভ্রুক্ষেপ করবে না। لَوْمَةَ لَائِمٍ –কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার। لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ –মানুষের দোষ-ক্রুটি সমালোচনা করো না। مَا تَعْلَمُ –যা তুমি জানো। مِنْ نَفْسِكَ –তোমার নিজের মধ্যে (যে দোষ-ক্রুটি) আছে।

সম্বোধন ঃ প্রিয় দ্বীনি/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/ বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে হাদীসের দারস পেশ করার জন্য হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসটি পাঠ ও অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্‌পাক যেন আমাকে হাদীসটির ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তাওফীক দান করেন।

হাদীসটি বর্ণনার সময়কাল ঃ আল-কুরআনের মতো হাদীস বর্ণনার সময়-কাল উল্লেখ করা কঠিন ব্যাপার। তার পরেও হাদীসের বিষয়বস্তু অনুযায়ী বলা যায়, সম্ভবতঃ হাদীসটি মক্কী যুগে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া রাবী হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ নাম–আবু যার গিফারী (রাঃ) এর প্রকৃত নাম বারির অথবা জুনদুব। **লকব**–মসিহুল ইসলাম। যহুদ, তাক্ওয়া, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসার অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে এই লকব দেন। তিনি বনু গিফার গোত্রের লোক ছিলেন। গিফার বিন মিবাল আবু যার (রাঃ) এর উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তারই

নামানুসারে এই গোত্রকে গিফারী গোত্র বলা হতো। বানু গিফারের অবস্থান ছিলো মদীনা থেকে ৮০ মাইল দূরে বদরের পাশে। তার পাশের সড়ক দিয়েই মক্কার লোকেরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করতো।

পিতার নাম–জানাদাহ্। **মাতার নাম**–রানলাহ্ বিনতে রবিয়াহ্। তিনিও গিফার গোত্রের মহিলা ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ– আবু যার গিফারী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে শিক্ষনীয় ঘটনা রয়েছে। গিফার গোত্র ছিলো অত্যন্ত গরীব এবং অভাবী। তারা বাণিজ্য কাফেলা এবং আশপাশের কবিলা লুণ্ঠন এবং লুটতরাজের মাধ্যমে জীবন-যাপন করতো। প্রথমে আবু যার গিফারী (রাঃ)ও যুবকদের সাথে লুটতরাজ, হত্যা এবং রাহাজানির কাজে জড়িত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে জ্ঞানচক্ষু দান করেন। আবু যার লুটতরাজ, হত্যা এবং রাহাজানির প্রতি বিরূপ হয়ে যান। সেই সাথে কবিলার দেব-দেবী এবং মূর্তিদের প্রতিও বৃতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। আল্লাহ্ তাঁকে তাওহীদের পথ দেখান এবং একক ভাবে দাওয়াত পাবার আগেই আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকতে লাগেন। মুসলিম শরীফে আছে, আবু যার (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেন। "আমি রাতে নামাজের জন্য দাঁড়াতাম এবং দাঁড়িয়েই থাকতাম, এমনকি সকাল হয়ে যেত। সেই সময় আমি নিজেকে মাটিতে নিক্ষেপ করতাম এবং এমন ভাবে পড়ে থাকতাম যেন কোন কাপড় পড়ে আছে। আমার উপর যখন রোদ পড়তো তখন আমি উঠতাম"।

তিনি রাসূলের স্বাক্ষাৎ পাবার আগেই **লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্র** কালিমা পড়তেন আর তার কবিলার লোকেরা আশ্চর্য হয়ে যেত এবং বলতো যে তাকে কোনো পাগলামীতে পেয়ে বসেছে। সে সময় মক্কাতেও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাওহীদের দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। একদিন গিফার গোত্রের এক লোক মক্কা গেল। সেখানে তার কানে হকের দাওয়াত পৌঁছলো। ফিরে এসে আবু যার (রাঃ) কে বললোঃ আবু যার, তোমার মতই মক্কাতেও এক বক্তি **লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্** বলে থাকেন এবং লোকদেরকে মূর্তি পূজা থেকে নিষেধ করেন। আবু যার (রাঃ) একথা শুনে ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং নিজ ভাই উনাইসকে স্বাক্ষাতের জন্য মক্কাতে পাঠান। তিনি মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কথা শুনে খুব প্রভাবিত হন এবং ফিরে এসে আবু যার (রাঃ) কে সব ঘটনা বললে তিনি সন্তুষ্টি

হতে না পেরে নিজেই মক্কা গমন করেন। মক্কা পৌঁছে আবু যার (রাঃ) কা'বাতে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি মুহাম্মদ (সাঃ) কে চিনতেন না। আবার তিনি পরিবেশের কারণে কাউকে জিজ্ঞেস করতেও পারছেন না। এভাবে কয়েকদিন চলে গেল। এদিকে হযরত আলী (রাঃ) তাকে এই অবস্থায় কয়েকদিন দেখে গোপনে তাকে মক্কা আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। আবু যার (রাঃ) তাকে গোপনীয়তা রক্ষার শর্তে মহানবী (সাঃ) এর কথা জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আলী (রাঃ) তার শর্ত পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে পৌঁছলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে তিনি দেখে বুঝে ফেললেন, ইনিই সেই চরম কাঙ্খিত ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ)। তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে দিনের দাওয়াতের বিষয় বিস্তারিত জানতে চাইলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন সুন্দর ভাবে বুঝালেন যে, সাথে সাথে আবু যার কালেমায়ে শাহাদাৎ পড়ে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হয়ে গেলেন। তার পূর্বে মাত্র চারজন ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছিলেন। তাঁরা হলেন (১) হযরত খাদিজা (রাঃ), (২) হযরত আবু বকর (রাঃ), (৩) হযরত আলী (রাঃ) এবং (৪) হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ)।

ইসলাম কবুলের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে নিজ কবিলায় চলে গিয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য বললেন এবং বর্তমানে মক্কাতে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আবু যার (রাঃ) পূর্ব থেকেই তাওহীদের আবেগে পূর্ণ ছিলেন। তাইতো তিনি আবেগ প্রবন হয়ে কাবা ঘরে ছুটে গিয়ে কাফেরদের মজলিসের সামনেই কালিমার ঘোষণা দিয়ে দিলেন। সাথে সাথে মুশরিক কাফেরদের দল ভীমরুলের মতো চারদিক থেকে ঘেরাও করে মারতে মারতে রক্তাক্ত করে ফেললো। এমতাবস্থায় হযরত আব্বাস (রাঃ) (তখনও তিনি ইসলাম কবুল করেননি) এসে হাজির হয়ে তাকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু তাওহীদের পাগল হযরত আবু যার পুনরায় দ্বিতীয় দিন কাবা ঘরের সামনে গিয়ে কাফেরদের উপস্থিতেই কালেমার দাওয়াত দিলে পুনরায় কাফেরেরা তাকে ধরে নির্যাতন শুরু করলো। এবারও আব্বাস (রাঃ) তাকে উদ্ধার করে বললেন ঃ এ কোন গোত্রের লোক জানো? এ হচ্ছে ডাকাত, যুদ্ধবাজ, রক্তপিপাসু গিফার গাত্রের লোক। তোমরা যদি তাকে মেরে ফেলো তাহলে তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলা চলাচল চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। গিফারীদের সঙ্গে খামাখা শত্রুতা কেন কিনে নিচ্ছো! এতে কাফেরেরা বুঝতে পারলো এবং তাকে

নির্যাতন করা থেকে সরে গেল।

আবু যার বুঝতে পারলেন যে, মক্কায় তার কথায় কোন আসর হবে না। তাই তিনি স্বদেশে রওয়ানা দেন এবং নিজ গোত্রে পৌঁছে সর্বপ্রথম দুই ভাই এবং মা'কে তাওহীদের দাওয়াত দিলে তারা তিনজনই মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর তিনি নিজ কবিলাকে ইসলামের আহবান জানালে অর্ধেক গোত্র তখনই মুসলমান হয়ে যায় এবং বাকী অর্ধেক মহানবী (সাঃ) এর হিজরাতের পর ঈমান আনে।

মৃত্যুঃ হযরত উসমান (রাঃ) এর খিলাফত কালে আবু যারের সাথে (কট্টর ধ্যান-ধারণার কারণে) তাঁর মতানৈক্য হলে তিনি তাকে রাবযাহ নামক নির্জন স্থানে গিয়ে বসবাসের পরামর্শ দেন। তিনি সেই পরামর্শ মোতাবেক পরিবার নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন। ৩১ অথবা ৩২ হিজরীতে আবু যার গিফারী (রাঃ) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং এই বীরান ভূমিতেই একাকী নিজ স্ত্রী এবং মেয়ের সামনে ইন্তেকাল করেন।

হাদীস বর্ণনার সংখ্যা ঃ হযরত আবু যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর খুব কাছের লোক হলেও তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা– মাত্র ২৮১টি। (আসহাবে রাসূলের জীবন কথা)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদেরকে হাদীসের অনুবাদ সহ প্রাথমিক ধারণা দেয়া হলো। এখন আপনাদের সামনে হাদীসটির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি।

একদা রাবী হযরত আবু যার গেফারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে কিছু নসিহত বা উপদেশ প্রদানের আবেদন জানালে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ উপদেশগুলো পর পর দিতে থাকেন। আর প্রায় প্রতিটি উপদেশের প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেন। হযরত আবু যার (রাঃ) আবেদন করেন ঃ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَوْصِنِىْ **হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আমাকে কিছু উপদেশ দিন।** রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার আবেদনের প্রেক্ষিতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেন।

প্রথম উপদেশ ঃ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ **আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, প্রত্যেকটি বিষয়ে অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় রাখবে।** রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রথম উপদেশটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ যা একজন মুমিনের ঈমান আনার পরই থাকা উচিত।

তাক্ওয়া কি ? تَقْوٰى আরবী শব্দটি وِقَايَةٌ শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ- ভয় করা, বিরত থাকা, আত্মরক্ষা করা, সাবধান হওয়া, আত্মশুদ্ধি, পরহেযগারী, নিজেকে কোন বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখা বা কোন অনিষ্ট হতে নিজেকে দূরে রাখা ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে আল্লাহ্র ভয় বা ভীতিকে তাকওয়া বলা হয়। ফারসী ভাষায় তাক্ওয়াকে বলা হয় পরহেজগারী। ইসলামী পরিভাষায় ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামী বিধানে নিষিদ্ধ সকল প্রকার কথা, কাজ ও চিন্তা পরিহার করে কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশ মতো জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্কে প্রতিনিয়ত প্রেমমাখা ভয় করে চলাকে তাক্ওয়া বলা হয়।

তাক্ওয়া সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ঃ আমাদের সমাজে অধিকাংশের মধ্যে ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে তাক্ওয়া বা পরহেজগারী সম্পর্কে ধারণা হলো বাহ্যিক বেশভূষা। যার মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ী, হাতে তসবীহ্ এবং গায়ে লম্বা জামা থাকে তাকেই মুত্তাকী বা পরহেজগার বলে মনে করে থাকে। অথচ শরীয়তে তাক্ওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বাহ্যিক দিকের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়নি। প্রকৃত পক্ষে তাক্ওয়া হলো অন্তরে বা দেলে আল্লাহ্র ভয়। আল্লাহ্র নবী (সাঃ) সাহাবাদের সামনে প্রায়ই তাক্ওয়ার ওয়াজ করতে গিয়ে তিনি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করে বলতেনঃ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا **তাক্ওয়া হলো এখানে।** অর্থাৎ দেলের মধ্যে। অত্র হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে **তুমি সব সময় অন্তরে আল্লাহ্র ভয় রাখবে।**

তাক্ওয়ার প্রভাব ঃ মহানবী (সাঃ) তাক্ওয়া বা অন্তরে আল্লাহ্র ভয় রাখার নসিহতের সাথে সাথে তার প্রভাবের কথাও উল্লেখ করে বলেন ঃ

فَاِنَّهُ اَزْيَنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهِ **কেননা ঐ একটা কথা বা গুণের কারণে তোমার সমস্ত আমল সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে যাবে।** এটা একটা বিজ্ঞচিত এবং ব্যাপক অর্থবোধক কথা। কেননা দেলের মধ্যে যদি 'খওফে এলাহী' বা 'আল্লাহ্র ভয়' থাকে তাহলে তার মন-মগজ, অন্যায় বা পাপ কাজের কোন চিন্তা বা পরিকল্পনা করতে পারে না। তার চোখ কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে না বা কুপথে চলার জন্য পথ দেখাতে পারে না। তার জিহ্বা বা জবান কোন কটু এবং অশ্লীল কথা বা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। তার হাত কোন অন্যায় বা পাপ কাজে বাড়াতে পারে না। তার পা কোন অন্যায়, অপকর্ম এবং পাপ কাজের দিকে এক কদমও চলতে পারে না। তার দেহ কোন অন্যায় ভোগ-

বিলাসে লিপ্ত হতে পারে না। তার যৌন চাহিদা অন্যায় এবং অবৈধ পথে মিটাতে পারে না। তার অন্যান্য ঋপুগুলো অন্যায় ও অবৈধ পথ থেকে বিরত থাকে। সুতরাং দেখা যাই এই একটা তাক্ওয়ার গুণের কারণে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন ভাবে দ্বীন তথা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মানার জন্য অনুগত হয়ে যায়, যা অন্য কোন বিষয় দ্বারা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্‌র রাসূল্ (সাঃ) তাক্ওয়ার উপদেশ দিয়ে তার ব্যাপক প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে বলেন, **এর জন্য তোমার সকল আ'মল সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে যাবে।**

দ্বিতীয় উপদেশ ঃ অত্র হাদীসে রাবী আবু যার গিফারী (রাঃ) আল্লাহ্‌র নবীকে আরও নসিহত বা উপদেশ দেবার জন্য আবেদন জানালে তিনি বললেন ঃ

عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ-

তুমি কুরআন তিলাওয়াত (অধ্যায়ন) এবং আল্লাহ্‌র যিকির (স্মরণ) করতে থাকো। এই উপদেশ বাণীতে দু'টো আ'মল বা কাজের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো কুরআন তিলাওয়াত এবং অপরটি হলো আল্লাহ্‌র যিকির।

কুরআন তিলাওয়াত ঃ আমাদের সমাজে কুরআন তিলাওয়াত অর্থ বুঝে থাকে কুরআন সূর দিয়ে পড়া। আসলে এতে কুরআন তিলাওয়াতের সঠিক অর্থ বুঝায় না। কুরআন তিলাওয়াত অর্থ হলো কুরআন অধ্যায়ন করা। অর্থাৎ কুরআনের অর্থ ও ভাব বুঝে সুন্দরভাবে পড়া এবং তার সাথে শিক্ষা গ্রহণ করা। তার কারণ হলো, কুরআন আরবীতে আরব দেশে নাযিল হয়। তারা আরবীর অর্থ জানার কারণে কুরআন পড়লেই তারা অর্থ এবং ভাব বুঝে ফেলতো। এই জন্য তিলাওয়াত অর্থই হলো কুরআন পড়ার সাথে সাথে তার অর্থ এবং ভাব অনুধাবন করা। আর এটাকেই বলা হয় কুরআন অধ্যায়ন, যার মাধ্যমে কুরআনের সঠিক জ্ঞান এবং বুঝ সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্‌র যিকির ঃ আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ যিকির অর্থ বুঝে থাকে খানকায় বা মসজিদে কোন এক বিশেষ সময়ে জমায়েত হয়ে চোখ বন্ধ করে, মাথা নীচু করে, মুরাকাবা-মুশাহাদার মাধ্যমে কলব জারি করে বিকট শব্দে اَللّٰهُ –اَللّٰهُ বলা। আসলে যিকির অর্থ এটা নয়। যিকির অর্থই হলো আল্লাহ্‌র স্মরণ। আল্লাহ্‌কে সকল সময় সকল অবস্থায় হাজির নাজির জানা। চলা-ফেরায়, উঠা-বসায়, শয়নে, কাজে-কামে সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখা। তবে হ্যাঁ, স্বরবে বা উচ্চারণের মাধ্যমেও যিকির করা যায়। কেননা যিকির

দু'প্রকার ঃ (i) যিকরে ক্বালবী বা অন্তরের যিকির এবং (ii) যিকরে লিসানী বা জিহ্বা কিম্বা মুখের যিকির। অর্থাৎ একজন মুমিন সদা-সর্বদা আল্লাহ্র কথা মনের মধ্যে স্মরণ রাখবে, কোন সময়েই ভুলে যাবে না। তাছাড়াও মাঝে মাঝে এবং অবসর সময়ে سُبْحَانَ اللّٰهِ-(আল্লাহ্ পবিত্র) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ(সব প্রশংসা আল্লাহ্র) اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ মহান বড়) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ- (আল্লাহ্ পবিত্র এবং সব প্রশংসা তারই) سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ। (মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা) ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করে যিকির করা যায়। তবে মাইক লাগিয়ে একই সাথে বসে বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে যিকির করা যাবে না। এটা সুন্নতের খেলাপ। কেননা এর দ্বারা রিয়া পয়দা হয়। মহান আল্লাহ্ নীরবে এবং স্বরবে যিকির করার তাগাদা এবং পদ্ধতি উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ-

আর যিকির (স্মরণ) করতে থাকো নিজ মনিবকে মনে মনে, কাঁদো কাঁদো ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং অনুচ্ছ স্বরে সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সারাদিন-রাত)। আর (যিকির না করে) গাফেলদের দলভুক্ত হয়ে যেওনা। (সুরা আ'রাফ-২০৫)

কুরআন তিলাওয়াত ও যিকিরের প্রভাব ঃ অত্র হাদীসে মহানবী (সাঃ) কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহ্র যিকিরের প্রভাব এর কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

فَاِنَّهٗ ذِكْرٌ لَّكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ-

কেননা এই আ'মলের কারণে আসমানে তোমার কথা আলোচিত হবে এবং যমীনে তুমি সম্মান লাভ করবে।

(i) আসমানে তোমার কথা আলোচিত হবে এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

এক. যারা কুরআন তিলাওয়াত (অধ্যায়ন) এবং যিকির (স্মরণ) করবে তাদের এই অভ্যাস বা আ'মলের কারণে আল্লাহ্ নিজেই গর্ববোধ করে আসমানের ফেরেশতাদের বলবেন, দেখ দেখ আমার বান্দারা কুরআন তিলাওয়াত এবং

যিকিরের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ করছে এবং গুণগান করছে।
হাদীসে আছে বান্দা যখন কোন ভাল কাজ করে তখন আল্লাহ্ প্রথমে নিজেই তার প্রশংসা করেন এবং তার পরে ফেরেশতাদেরকে অবহিত করেন। এজন্য নিজেই নিজের আ'মল প্রকাশ না করা উচিত।

দুই. দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে, আসমানের ফেরেশতারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির এই আ'মলের জন্য আলোচনা করবে, প্রশংসা করবে এবং তার জন্য কল্যাণের দোআ করবে।

(ii) কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ্র যিকিরের দ্বিতীয় প্রভাব হলো যমীনে অর্থাৎ পৃথিবীতে সম্মান-শ্রদ্ধা লাভ করবে। কেননা যখন কোন বান্দা কুরআন তিলাওয়াত বা অধ্যায়নের মাধ্যমে তার প্রকৃত জ্ঞান এবং শিক্ষা অর্জন করে বাস্তব জীবনে আ'মল করবে তখন সে একজন ভাল এবং উত্তম মানুষে পরিণত হবে। আর যিকির বা সার্বক্ষণিক আল্লাহ্কে স্মরণের মাধ্যমে যখন সে তার প্রতিটি কাজকে সুন্দর করবে, তার আ'মল আখলাক সুন্দর হবে, চরিত্র এবং নীতি নৈতিকতা সৃষ্টি হবে তখন সে সমাজে উত্তম মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হবে। আর তার এই উত্তম আ'মল এবং চরিত্রের কারণে মানুষ তাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে তাঁর দুষমনেরাও সম্মান করতে বাধ্য হয়েছিলো।

তৃতীয় উপদেশ ঃ বর্ণনাকারী আরও নসিহতের জন্য আরয করলে আল্লাহ্র নবী (সাঃ) বললেন ঃ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ-

তুমি প্রায়ই চুপ-চাপ অবস্থায় জীবন যপন করবে। এই উপদেশের মধ্যেও দু'টি অর্থ হতে পারে-

এক. নিশ্চুপ অবস্থায় জীবন যাপন অর্থ বেশী-বেশী বা অতিরঞ্জিত কথাবার্তা না বলা। অহেতুক এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় জড়িয়ে না পড়া। মেপে মেপে কথা বলা। কেননা কথা বেশী বললে বেশী ভুল হয়।

দুই. নিশ্চুপ জীবন যাপন মানে সাদা-সিদে, চুপ-চাপ জীবন যাপন করা। বেশী আড়াম্বরপূর্ণ জাক-জমক জীবন যাপন না করা। বরং স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। এমন জীবন যাপন যে জীবন-যাপনে কোন রীয়া বা অহমিকা পয়দা হয় না।

চুপ-চাপ জীবন যাপনের প্রভাব ঃ অধিক সময় চুপ-চাপ জীবন যাপন করলে তার ফায়দা বা প্রভাব বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দু'টি প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম প্রভাব ঃ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ **কেননা এ অভ্যাস শয়তানকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।** শয়তানের কাজ বা কৌশল হলো বান্দাকে অন্যায় এবং পাপের পথে নিয়ে আসা। সুতরাং যখন কেউ চুপ-চাপ জীবন যাপন করে তখন সে বেশী সতর্ক থাকে, ভাল-মন্দ কথা-কাজের পার্থক্য করতে পারে, শয়তান অস্অয়াসা দেবার সুযোগ পায় না। যার ফলে সে কোন অশ্লীল, পাপ এবং অন্যায় কথায় জড়িয়ে পড়ে না। আর বান্দার এই অভ্যাসের কারণে শয়তান কাছে ঘেঁষার সুযোগই পায় না। তাছাড়া কেউ চুপ-চাপ অনাড়াম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করলে তার মধ্যে রীয়া বা অহংকার পয়দা হয় না। শয়তানের তো বড় দোষ হলো সে মহা অহংকারী এবং দাম্ভীক। সুতরাং এই গুণের কারণে শয়তান কাছে ঘেঁষতে সুযোগ পায় না। ফলে শয়তানেরও কোন ফায়দা হয় না। আর মানুষ যদি বেশী চুপ-চাপ থাকে, কম কথা বলে, মেপে মেপে কথা বলে, তখন কথায় কম ভুল হয়। অশ্লীল কথা বের হয় না। গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চার মতো অন্যায় ও পাপ কথার চর্চা হয় না। ফলে শয়তানের যে মিশন তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রভাব ঃ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِيْنِكَ **আর তোমার দ্বীনের সব কাজে সহায়তা করে।** কেউ যদি প্রায়ই সময় চুপ-চাপ জীবন যাপন করে, তবে তার দ্বীনের কাজে তা সহায়ক হয়। এই অভ্যাসের জন্য দ্বীন তথা জীবন বিধান ইসলামের প্রতিটি কাজের চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। পরিকল্পনা নিতে পারে। আবেগমুক্ত হয়ে ইসলামের প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। তাড়াহুড়া করে না। অস্থিরতা সৃষ্টি হয় না। সুতরাং দ্বীনের প্রতিটা কাজ সুন্দর এবং সূচারুরূপে বাস্তবায়ন করতে পারে।

চতুর্থ উপদেশ ঃ আবু যার আরো উপদেশের জন্য আবেদন করলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ -

তুমি বেশী বেশী হাসা-হাসি করবে না। এখানে উপদেশ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বেশী বেশী হাসা-হাসি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা মুমি-নদের জন্য দুনিয়ার এই জীবন হাসি-তামাসার জন্য নয়। বরং আখেরাতে নাযাতের জন্য প্রস্তুতির জায়গা। যেমন কোন ব্যক্তি যখন কোন গন্তব্যে পৌছার জন্য প্রস্তুতি নেয়, যেই গন্তব্যে ঝুঁকি আছে। তখন সে অত্যন্ত আনন্দ-ফুর্তির সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। বরং অত্যন্ত পেরেশানী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং

সতর্কতার সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে দুনিয়ার এই জীবন হলো মানুষের চূড়ান্ত টার্গেটে পৌঁছার প্রস্তুতির জায়গা। আল্লাহ্‌র রাসূল বলেনঃ اَلدُّنْيَاءُ مَزْرَعَةُالْاٰخِرَةِ- **দুনিয়া হলো আখেরাতের (প্রস্তুতির) ক্ষেত বা জায়গা।** মানুষ যদি দুনিয়ার এই জীবনে সঠিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে তা হলে আখেরাতের জীবনের সফলতা লাভ করে চির সুখে জান্নাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আর যদি এখানে প্রস্তুতি নিতে ভুল হয়ে যায়, তাহলে পরকালের কঠিন শাস্তির জায়গা জাহান্নামে যেতে হবে। তাইতো নবী পাক (সাঃ) তার সাহাবাদেরকে হাসা-হাসির প্রসঙ্গে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ **তোমরা যদি দোযখের শাস্তি স্বচক্ষে দেখতে তাহলে কম হাসতে এবং বেশী বেশী কাঁদতে। বেশী বেশী হাসার প্রভাব ঃ** মহানবী (সাঃ) বেশী বেশী হাসার প্রভাব বা পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেনঃ

فَاِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهِبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ **কেননা তাতে অন্তরের মৃত্যু ঘটে এবং চেহারার উজ্জ্বলতা লোপ পেতে থাকে।** এখানে বেশী বেশী হাসা-হাসির প্রভাবের কারণে দু'টি ক্ষতির কথা বলা হয়েছে।

প্রথম ক্ষতি ঃ অন্তরের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ বেশী বেশী হাসা-হাসির কারণে অন্তর মরে যায়। অন্তরে ধারণ ক্ষমতা থাকে না। পরকালের কথা মনে পড়ে না। অন্তরে জাহান্নামের ভয় সৃষ্টি হয় না। সব সময় যদি হাসা-হাসি এবং আনন্দ-ফূর্তিতে থাকে তাহলে তার জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ করতে পারে না। যার ফলে সে আত্মভোলা ও আত্মহারা হয়ে অন্যায়-অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে এবং দুনিয়াদারীতে ব্যস্ত হয়ে যায়। যার ফলে তাকে জাহান্নামে যেতে হয়।

দ্বিতীয় ক্ষতি ঃ বেশী বেশী হাসা-হাসির কারণে চেহারার উজ্জ্বলতা কমে যায়। এটা একটা তাত্বিক কূ-প্রভাব। বেশী বেশী হাসা-হাসির কারণে মানুষের চেহারার যে লাবণ্য বা উজ্জ্বলতা থাকে তা মলিন হয়ে যায়। যে আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করে তার চেহারায় নূরের একটা উজ্জ্বলতা ফুটে উঠে। কিন্তু যখন সে হাসা-হাসির মধ্যে জীবনকে অতিবাহিত করে তখন সে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তার চেহারায় যে নূর বা উজ্জ্বলতা থাকে তা লোপ পেয়ে যায়।

পঞ্চম উপদেশ ঃ আবু যার গিফারী (রাঃ) আবারও নসিহতের জন্য আরয করলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا

তিক্ত বা কটু হলেও সদা-সর্বদা হক বা সত্য কথা বলবে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত, যা মানুষ অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে সত্য বলতে চায় না। সেটা ভয়ের কারণে হতে পারে, অথবা চক্ষু লজ্জার কারণে হতে পারে, আবার ব্যক্তি স্বার্থের কারণেও হতে পারে। এ জন্যই কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) সত্যের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ **তিক্ত বা অসন্তষ্টির কারণ হলেও সত্যকথা বলবে।** প্রবাদ আছে اَلْحَقُّ مُرٌّ **হক বা সত্য কথা তিতো।** কেননা হক বা সত্য কথা বা সত্য ঘটনা বর্ণনা করলে মানুষের স্বার্থে বা সম্মানে আঘাত লাগে। ফলে সে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বার্থবাজদের এই অসন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করে নির্দিধায় সত্য কথা, সত্য বিবৃতি, সত্য ভাষণ, সত্য স্বাক্ষী, সত্য ঘটনা বর্ণনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সত্যবাদিতা মুমিনের একটা বিশেষ গুণ। কেননা সত্যবাদিতা মানুষকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়। এই মর্মে মহানবী (সাঃ) অপর এক হাদীসে বলেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى اِلَى الْجَنَّةِ-

তোমরা সদা সত্য বলবে। কেননা সত্যবাদিতা নেকী'র দিকে নিয়ে যায় এবং নেকী জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়। (বুখারী মুসলিম)

ষষ্ঠ উপদেশ ঃ রাবী পুনরায় নসিহতের জন্য আবেদন করলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ لَا تَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

তুমি আল্লাহ্র কাজে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভ্রুক্ষেপ বা পরওয়া করবে না। আল্লাহ্র কাজ তথা আল্লাহ্র দ্বীনের কাজ। আল্লাহ্র দ্বীন পালন বা প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গেলেই কেবলমাত্র বিরোধীরা তিরস্কার বা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে কাফের-মুশরেকরা যাদুকর, কবি, গনক ইত্যাদি বলে বিদ্রুপ করেছিলো। আবার 'আবতার' বা লেজকাটা-বংশহীন বলে তিরস্কার করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ্র নবী (সাঃ) তাদের এই তিরস্কার এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপকে উপেক্ষা করে আল্লাহ্র দ্বীনের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে আমাদের এই দেশেও আল্লাহ্‌র কাজ তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গেলে ইসলাম বিরোধীরা বিভিন্ন প্রকার উক্তি করে থাকে। যেমন বলে- রেজাকার, আলবদর, তালেবান, হারকাতুল জিহাদ, আল কায়েদা, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বলে বিদ্রুপ বা তিরস্কার করে। এসব বিদ্রুপ ও কটুক্তির পেছনে মূল কারণই হলো আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে সরিয়ে দেয়া। মন ভাঙ্গা করে নিষ্ক্রীয় করে দেয়া। মহানবী (সাঃ) অত্র হাদীসে উল্লেখ করেছেন "তোমাদেরকে যেন এসব তিরস্কারকারীদের তিরস্কার আল্লাহ্‌র কাজ থেকে বিরত করতে না পারে"। সুতরাং এটাকে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে পরীক্ষা মনে করে আন্দোলনের কাজকে তীব্র থেকে আরো তীব্রতর করতে হবে। এই কাজের জন্য ভয় করা যাবে না ও মন ভাঙ্গা হয়ে নিষ্ক্রীয়ও হওয়া যাবে না। বরং এসব কিছুকে উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

সপ্তম উপদেশ ঃ রাবী আবু যার (রাঃ) রাসূলের কাছে উপদেশের জন্য সর্বশেষ আবেদন করলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ

لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ.

তোমার মধ্যে যে দোষ-ক্রুটি আছে বলে তুমি জানো অন্যের সেই দোষ-ক্রুটি নিয়ে সমালোচনা করো না।

অত্র হাদীসে এক থেকে ছয় পর্যন্ত যে সব উপদেশ দেয়া হয়েছে তা হলো আল্লাহ্‌র হক বা অধিকার সংক্রান্ত। আর এই সপ্তম এবং সর্বশেষ উপদেশটি হলো বান্দার হক বা অধিকার সংক্রান্ত।

প্রতিটা মানুষের মধ্যে কম হোক বেশী হোক কিছু না কিছু ক্রুটি-বিচ্যুতি আছে। কেউই ক্রুটি মুক্ত নয়। একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ই ক্রুটিমুক্ত ছিলেন। তিনি মানুষ হিসেবে ভুল করলে সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালা অহী দ্বারা তা সংশোধন করে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের সকলেরই কোন না কোন ক্রুটি আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে উপদেশ দিচ্ছেন নিজের মধ্যে যে ক্রুটি-বিচ্যুতি আছে তা অন্যের মধ্যে থাকলে তা নিয়ে সমালোচনা-পর্যালোচনা না করার। কেননা তা যদি করা হয়, তাহলে সেই ভাই এর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হবে এবং নিজের ক্রুটি বিচ্যুতি আরো বেড়ে যাবে। কেননা পরের দোষ খুঁজতে খুঁজতেই তার সময় পার হয়ে যাবে, নিজের দোষ খোঁজার সময় তার হবে না। ফলে তার ক্রুটি লোপ পাবে না বরং বৃদ্ধি হতেই থাকবে। বরং অন্যের দোষ-ক্রুটি

খোঁজাখুঁজি না করে নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করার জন্য প্রতিনিয়ত আত্মবিচার, আত্মসমালোচনা করে নিজের ত্রুটিগুলো দুর করার চেষ্টা করা। আর অন্য ভাই এর ত্রুটিগুলো মুহাসাবার মাধ্যমে গঠনমূলক সমালোচনা করে সংশোধনের ব্যবস্থা করা। এটা পরস্পর পরস্পরের অধিকার। কেননা মুহাসাবা দ্বারা যেমন গীবতের মতো কঠিন গুনাহ থেকে ব্যক্তি নিজে বাঁচতে পারে, তেমনি অন্য ভাইও সংশোধনের সুযোগ পেয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! হাদীসে হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে যেভাবে একের পর এক নসিহত বা উপদেশের জন্য আবেদন জানাচ্ছিলেন, তাতে তিনি যদি আরো আরো আরয করতেন তাহলে হয়তো আল্লাহ্র নবী (সাঃ) আরও উপদেশ দিতেন। যা হোক আবু যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে এখানে সাতবার আবেদন জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) মোট আটটি উপদেশ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে সেই সব আ'মলের বা অভ্যাসের প্রভাবগুলোও উল্লেখ করে দিয়েছেন। যা আমাদের সকলের জীবনের জন্য অত্যন্ত শিক্ষনীয়, গ্রহণীয় এবং আ'মলযোগ্য।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! উপরে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর আমাদের জন্য যে সব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা হলো ঃ

✪ দ্বীন তথা ইসলামের আ'মল বা কাজ জানা এবং মানার জন্য তীব্র আকাংখা থাকা। যেভাবে আবেদনকারী রাবী আবু যার গিফারী (রাঃ) এর মধ্যে দেখা গিয়েছে।

✪ সদা-সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করে চলা। মনের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় রাখা। আল্লাহ্র ভয়েই তাঁর নির্দেশিত কাজগুলো করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা। আর আল্লাহ্র ভয় তথা তাক্ওয়ার গুণের মাধ্যমে গোটা জীবন অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলা।

✪ প্রতিদিন পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ নিজের ভাষায় বুঝে তিলাওয়াত বা অধ্যায়ন করা এবং তার শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গঠন ও পরিচালনা করা।

✪ সকল সময় সকল অবস্থায় তথা– চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষ-বাস, লেখা-পড়া, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, শোয়া-বসায় আল্লাহ্কে স্মরণ রাখা এবং মাঝে মাঝে আল্লাহ্র তাহ্লীল, তাহ্মীদ এবং তাসবীহর মাধ্যমে মুখে

অনুচ্চস্বরে যিকির করা। আর এরই মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একজন খাঁটি বান্দা হিসেবে সমাজের কাছে পেশ করা।

✪ স্বাভাবিক এবং চুপ-চাপ গাম্ভির্যপূর্ণ জীবন যাপন করা। বেশী বেশী এবং অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা, যাতে মানুষ বাচাল হিসেবে আখ্যায়িত না করে। আড়াম্বরপূর্ণ জীবন, গর্ব-অহংকার এবং প্রদর্শনেচ্ছা থেকে মুক্ত থাকা। কেননা এতে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং দ্বীনি কাজ করতে সহায়ক হয়।

✪ বেশী বেশী হাসা-হাসি না করা। অট্টহাসি না দেয়া। কেননা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এই হাসি হাসতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলতে আদেশ করেছেন। বেশী বেশী হাসা-হাসি করলে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে দেল মরে যায়।

✪ সদা-সর্বদা সত্য কথা বলা, সততার সাথে কাজ করা, সত্য ভাষণ, বিবৃতি এবং স্বাক্ষ্য দেয়া। জীবনের ঝুঁকি থাকলেও এবং মানুষের স্বার্থে আঘাত লাগলেও সত্য বলা। নিজেকে সততার পরিচয় দেয়া, যাতে মানুষ সত্যবাদি হিসেবে জানে এবং আল্লাহ্‌ও এই সত্যবাদিতার জন্য তাকে জান্নাত দান করেন।

✪ সকল প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রুপ, তিরস্কার এবং ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে দ্বীন তথা ইসলামের কাজ অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যাওয়া। কারো কোন কটু কথা বা কাজে পরওয়া না করা। বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে এটাকে পরীক্ষা এবং নবীর সুন্নত মনে করে আন্দোলনের গতিকে তীব্র থেকে আরো তীব্রতর করা।

✪ অন্যের দোষ খোঁজা-খোঁজি এবং সমালোচনা না করে নিজের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা এবং সেইসব দোষ-ত্রুটিকে আত্ম সমালোচনার মাধ্যমে দূর করা। অপর পক্ষে অন্যের দোষ গোপন রাখা। আর যদি এর দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গঠনমূলক ভাবে দরদী মন নিয়ে মুহাসাবার মাধ্যমে ত্রুটি মুক্ত করার চেষ্টা করা। আর নিজের এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা।

আহবান ঃ প্রিয় দ্বীনি ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর আমরা সবাই যেন হাদীস থেকে যে সব শিক্ষা লাভ করলাম তা বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি তার তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌।

দুই

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণতি

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْ لَيَسْحِتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْلَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شَرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ- (مُسْنَدِ اَحْمَدْ)

অনুবাদ ঃ হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ অবশ্য অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাধা দেবে। আর উত্তম কল্যাণকর কাজ করার জন্য উৎসাহ্ উদ্দীপনা দেবে। তা না হলে আল্লাহ্ তাআলা যে কোন আযাব দিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। অথবা তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশী পাপী ও জালেম লোককে তোমাদের শাসক বানিয়ে দেবেন। এমতাবস্থায় তোমাদের মধ্যে নেক্‌কার লোকেরা (এসব থেকে) মুক্তি পাবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করবে। কিন্তু তাদের দোআ কবুল করা হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ –থেকে বা হতে। اِبْنِ –ছেলে বা বেটা। قَالَ –বলা বা বলেন। لَتَأْمُرُنَّ –অবশ্যই তোমরা আদেশ দেবে। بِالْمَعْرُوْفِ –সৎ বা উত্তম কাজের। لَتَنْهَوُنَّ –অবশ্যই তোমরা নিষেধ করবে বা বাধা দেবে। اَلْمُنْكَرْ –অসৎ বা অন্যায় কাজের। وَلَتَحَاضُّنَّ –এবং অবশ্যই উৎসাহ উদ্দিপনা দেবে। عَلٰى –উপর এখানে ব্যাপারে।

اَلْخَيْر -উত্তম বা কল্যাণকর। اَوْ -অথবা এখানে তা না হলে لَيُسْحِتَنَّكُمُ اللهُ -অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। جَمِيْعًا -সবাইকে। بِعَذَابٍ -আযাব দিয়ে। اَوْ -অথবা। لَيُؤَمِّرَنَّ- অবশ্যই আমীর বা শাসক বানিয়ে দেবেন। عَلَيْكُمْ -তোমাদের উপর। شِرَارَكُمْ -তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট বা পাপীকে। ثُمَّ -অতঃপর। يَدْعُوْنَ তোমরা দোআ করবে। خِيَارُكُمْ -তোমাদের উত্তম বা নেক্কার লোকেরা। فَلَا -অতঃপর করা হবে না। يُسْتَجَابُ لَهُمْ -তাদের (দোআর) জবাব দেয়া বা গ্রহণ করা।

সম্বোধন ঃ দারসে হাদীস প্রোগ্রামে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনি/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সংকলিত বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থ 'আহমদ' থেকে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুযাইফা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসটি পাঠ এবং অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন যেন আমাকে অত্র হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তাওফীক দান করেন। আমীন।

রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ নাম–হুযাইফা। **কুনিয়াত**-আবু আবদুল্লাহ্। **লকব**– "সাহিবুস সিরারি রাসূলুল্লাহ্।" এই লকব দানের কারণ হলো রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে মুনাফিকদের নাম বলে দিয়েছিলেন। আর তিনি সেসব নাম বিশ্বস্ততার সঙ্গে হেফাজত করতেন।

পিতার নাম– হুসাল অথবা হুসাইল ছিল। তবে তিনি আল ইয়ামান নামে মশহুর (পরিচিত) ছিলেন। এই নামে তিনি এত পরিচিত ছিলেন যে, লোকজন তার আসল নাম ভুলেই গিয়েছিলো।

মাতার নাম– রুবাব বিনতে কা'ব। তিনি আউস গোত্রের মহিলা ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ– পিতা-পুত্র উভয়ে তখন ইয়াসরীবে (মদীনার পূর্ব নাম) বসবাস করতেন। ইয়াসরীব থেকেই তারা মক্কায় নবী আগমনের খবর পান এবং তারা কুরাইশদের অত্যাচারের খবরও শুনেছিলেন। তারা উভয়েই সৎ স্বভাবের লোক ছিলেন। তাদের অন্তরে সাড়া দিলো নবীর দাওয়াত কবুল করার।এজন্য তারা

দেরীতে দাওয়াত কবুল করা ক্ষতির কারণ হবে চিন্তা করে পিতা-পুত্র উভয়ে সকল ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে মক্কায় গমন করেন এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করেন। হযরত হুযাইফার পিতা হুসাইন (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের চরম বিশৃঙ্খলার সময় ভুলক্রমে মুসলমানদের হাতেই শহীদ হন।

হুযাইফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর একজন সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি পরবর্তী খেলাফতের যুগেও বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব পালন করেন। হযরত উমর ও ওসমান (রাঃ) এর যুগেও মাদায়েনের গভর্ণরের দায়িত্ব পারন করেন। তিনি ৩০ হিজরীতে গভর্ণরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এর খেলাফতের শেষ দিকে তিনি পুনরায় মাদায়েনের গভর্ণরী পদে ফিরে আসেন এবং এখানেই ৩৫ হিজরীতে হযরত ওসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের ৪০ দিন পর ইন্তেকাল করেন। হযরত হুযাইফা (রাঃ) যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে খুব বেশী হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ পাননি। তার পরেও জানা যায় তিনি প্রায় ১০০ টিরও বেশী হাদীস বর্ণনা করেন।

বর্ণিত হাদীস গ্রন্থের পরিচয় ঃ বর্ণিত হাদীসটি 'মুসনাদে আহমদ' কিতাবে সংকলিত হয়েছে। কিতাবটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সংকলিত সহীহ্ কিতাব। যদিও এটি "সিহাহ্ সিত্তার" অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীসটি বর্ণনার সময়কাল ঃ আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) হাদীসটি কখন বর্ণনা করেছেন নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও হাদীসটির বিষয়বস্তু থেকে মনে হয়, তিনি মাদানী জীবনে বর্ণনা করেছেন। কেননা, হাদীসে আদেশ-নিষেধের কথা এবং আমীর বা শাসকের কথা উল্লেখ রয়েছে। যা মাদানী জীবন থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য ছিলো এবং থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে পঠিত হাদীসটির অনুবাদ এবং প্রাথমিক কিছু পরিচয় তুলে ধরলাম। এখন হাদীসটির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি। হাদীসের প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল মুসল-মানদের করণীয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ

لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ

তোমরা অবশ্য অবশ্যই মানুষকে ভাল ও উত্তম কাজের প্রতি আদেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বারণ করবে। আর ভাল ও কল্যাণকর কাজ করার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা দেবে। হাদীসের এই অংশে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা বলেছেন। যার মধ্যে দু'টো হা বোধক অর্থাৎ আদেশ সূচক এবং একটা না বোধক অর্থাৎ নিষেধ সূচক কাজের কথা সকলকেই করার জন্য তাগাদা দিয়েছেন। যা না করলে পরবর্তী অংশে সামগ্রীক ক্ষতির কথাও উল্লেখ করেছেন। কাজ তিনটি হলো ঃ

এক. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ-অবশ্য অবশ্যই তোমরা নেক বা উত্তম কাজের আদেশ দেবে।

দুই. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ-এবং অবশ্য অবশ্যই তোমরা অন্যায় বা অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে।

তিন. وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ-আর অবশ্যই তোমরা উত্তম ও কল্যাণকর কাজের জন্য লোকদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেবে।

অত্র হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে যে তিনটি কাজের কথা বলেছেন তা আল্লাহ্ তাআলাও আল কুরআনে অসংখ্য জায়গায় উল্লেখ করেছেন। যেমন- সূরা আলে ঈমরানের ১০৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন –

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকা উচিত, যারা মানুষকে ভাল কাজের দিকে ডাকবে এবং আদেশ দিবে উত্তম কাজের প্রতি এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর যারা এসব কাজ করে তারাই হলো সফলকামী।

আল্লাহ্‌পাক একই সূরার ১১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করে বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

তোমরাই হলে (মানুষের মধ্যে) সর্বোত্তম দল, মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের আগমন। সুতরাং তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজে বাধা দেবে।

উপরোক্ত আয়াত দু'টোতে বলা হয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে এমন একটা দল থাকবে যারা হবে অতি উত্তম এবং মধ্যমপন্থী। আর তাদের কাজ কি হবে তাও বাতলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আদেশ এবং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের মাধ্যমে এটাই বুঝা যায় যে, মুসলমানেরা সদা-সর্বদা মানুষকে ভাল ও নেক কাজের আদেশ দেবে এব্ং মন্দ ও পাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর ভাল কাজ করার পরিবেশ দেবে এবং উত্তম ও নেক কাজ করার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা দেবে। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীর কাজই হবে সদা-সর্বদা নিজে উত্তম, নেক ও ভাল ভাল কাজ করা এবং অন্যদেরকেও তা পালন করার জন্য নির্দেশ দেয়া, উৎসাহ-উদ্দীপনা দেয়া। আর নিজে অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং অন্যদেরকেও তা থেকে বাধা দেয়া, নিষেধ বা বারণ করা। কেননা ঈমানের দাবীদারদের ইমানের দাবীই হলো এটি।

অন্য হাদীসে ঈমানের দাবীদারদের ঈমানের ক্যাটাগরী উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ (مُسْلِمْ)

তোমাদের কেউ যখন কোন অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজ হতে দেখবে তখন সে যেনো তার হাত (ক্ষমতা) দিয়ে তা প্রতিহত করে। যদি সে

একাজ করার পরিবেশ না পায়, তবে সে যেনো তার যবান (বক্তৃতা, বিবৃতি ও আলাপ-আলোচনার) দ্বারা তা প্রতিহত করে। এতেও যদি সে সক্ষম না হয়, তবে সে যেনো তার অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে। (অর্থাৎ তাতে ঘৃণা পোষণ করবে এবং পরিকল্পনা করে তা প্রতিহতোর চেষ্টা করবে।) আর এই পর্যায় হচ্ছে ঈমানের দূর্বলতম পর্যায়। (মুসলিম) অত্র হাদীসে প্রথম শ্রেণী বা ক্যাটাগরীর ঈমানদার হলো তারাই যারা ক্ষমতা দ্বারা অন্যায় কাজকে প্রতিহত করে। ক্ষমতা দ্বারা অন্যায় এবং অপরাধ প্রতিহত করতে হলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন। আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধ বা দলবদ্ধ ভাবে জিহাদ করা আন্দোলন করা। প্রকৃত মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র হোক অথবা ইসলামী রাষ্ট্র না হোক সকল অবস্থায় ভাল কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আর এটাই হলো ঈমানের দাবী। কেননা ঈমানদার ব্যক্তি কোন সময়ের জন্য দু'টো কাজ বন্ধ করবে না। তার একটা হলো ভাল কাজের আদেশ এবং অন্যটা হলো অন্যায় ও পাপ কাজে নিষেধ। আর যদি কোন সমাজের লোক এ দু'টো কাজ থেকে উদাসীন হয়ে বিরত থাকে তা হলে যে সব ক্ষতি হবে তার কথা উল্লেখ করে হাদীসের শেষ অংশে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

أَوْ لَيَسْحِتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شَرَارَكُمْ-

তা না হলে অবশ্যই আল্লাহ্ যে কোন আযাব দিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। অথবা তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশী পাপী ও যালেম লোককে তোমাদের নেতা বা শাসক বানিয়ে দেবেন।

হাদীসের এই অংশে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। যদি কোন সমাজ অন্যায়, অপকর্ম ও পাপাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর সেই সমাজের লোকেরা গাফেল এবং উদাসীন থাকে। আর তা থেকে সমাজকে বাঁচার জন্য চেষ্টা না করে, জিহাদ ও আন্দোলন না করে। তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে দু'ধরনের আযাব দিয়ে শাস্তি দেবেন।

এক. এই অপরাধের কারণে আল্লাহ্ অসন্তোষ হয়ে এক সামগ্রীক আযাব দিয়ে সেই সমাজকে ধ্বংস করে দেবেন। যেভাবে পূর্বের নবীদের অবাধ্য উম্মতদের

ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যেমন– মাদইয়ান বাসীদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। লুৎ কওমকে ফেরেশতা দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সামুদ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। নূহ এর জাতিকে প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তবে হ্যাঁ নবীর উম্মতকে সেই ভাবে (রাসূলের দোআর কারণে) সমূলে ধ্বংস করে না দিলেও বিভিন্ন আযাব-গযব দিয়ে শাস্তি দেবেন। যেমন-অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, টর্নেডো, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, হ্যারিকেন, বন্যা, ভূকম্পন, মহামারী এবং সর্বোপরি সামাজিক অশান্তি দিয়ে শাস্তি দেবেন।

দুই. ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করার জন্য যদি কেউ চেষ্টা না করে, জিহাদ বা আন্দোলন না করে, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা শাস্তি হিসেবে দ্বিতীয় যেই আযাবটি দেবেন তা হলো– **সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাপাচারী এবং যালেম লোককে সেই সমাজের নেতা বা শাসক বানিয়ে দেবেন**। আর সেই পাপী ও জালেম নেতা বা শাসক সেই জাতির ঘাড়ের উপর সওয়ার হয়ে অত্যাচারের ষ্ট্রীম রোলার চালাবে। জাতিকে পাপাচারে লিপ্ত করে অতিষ্ঠ করে তোলবে। সমাজের মধ্যে যারা একটু সৎ এবং নেককার তাদেরকে জেল, যুলুম, অত্যাচার-নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করে রাখবে। সমাজের অপরাধী ও পাপাচারী লোকদের দৌরাত্ম বেড়ে যাবে। খুন, হত্যা, রাহাজানিতে সমাজ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। যার কারণে মানুষ অসহায় ও নিরাপত্তাহীন হয়ে কঠিন হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হবে।

এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তাআলা দায়ী নন বরং সেই সমাজের লোকেরাই দায়ী। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ.

জলে ও স্থলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তা সেই জাতিরই নিজেদের অর্জিত কর্মের প্রতিফল। (সূরা রূম–৪০)

হাদীসে উল্লেখিত তিনটি কাজ জাতির লোকেরা বন্ধ করে দেয়ার ফলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেই জাতির উপর যেসব গযব-আযাব এবং শাস্তি নেমে আসবে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সমাজে যারা নিজেদেরকে নেককার ও পরহেযগার এবং ভাল মানুষ হিসেবে মনে করে তারা দোআ করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সেই দোআ কবুল করবেন না। এই মর্মে হাদীসের সর্বশেষ অংশে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ-

অতঃপর এমতাবস্থায় তোমাদের মধ্যে নেককার লোকেরা এসব থেকে মুক্তি পাবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করবে। কিন্তু তাদের দোআ কবুল করা হবে না।

আল্লাহ্ এসব লোকদের দোআকে প্রত্যাখ্যান করবেন। তার কারণ হলো এরা পাপাচারি সমাজে বসবাস করে নিজেদেরকে মসজিদ ও খানকায় সীমাবদ্ধ রেখে নেককার, পরহেযগার ও ভাল মানুষ মনে করে। যারা অপকর্ম এবং পাপাচারে লিপ্ত থাকে তাদেরকে তারা বাধা দেয় না। তাদেরকে সেই অন্যায় কাজ থেকে মুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে না। তারা নিজেদেরকে সমাজ বিচ্যুত রেখে ভাল মানুষ সাজে। তাস্‌বীহ-তাহলীল, মুরাকাবা-মুশাহাদা, যিকির-আযকারের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করে। কিন্তু আল্লাহ্ এবং রাসূলের দৃষ্টিতে এই সমাজের পাপাচারী এবং ভাল মানুষের দাবীদারেরা একই রকম, একই অপরাধী। বুখারী শরীফে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর এই সম্পর্কে একটি চমৎকার হাদীস বর্ণনা রয়েছে। উক্ত হাদীসটি হলো- **"মহানবী (সাঃ) একদা তার সাহাবাদের সামনে সমাজের উদাহরণ টেনে বর্ণনা করেন, মনে করো একটা দ্বোতলা কিস্তী বা জাহাজ। সেই জাহাজে আরোহনের জন্য কোরার (লটারীর) মাধ্যমে একদল লোক দ্বোতলায় সুযোগ পেল এবং আর একদল লোক নীচতলায় আরোহন করলো। নীচতলার লোকেরা পানির জন্য বার বার দ্বোতলায় যেতে লাগলো। এতে দ্বোতলার আরোহীরা বিরক্ত বোধ করলো। ফলে নীচতলার লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে কূড়াল হাতে নিলো এবং** জাহাজের তলা ছিদ্র করে পানি নিতে উদ্দোত হলো। (রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) **সাহাবাদের প্রশ্ন করলেন) এখন দ্বোতলার লোকদের কাজ কি হবে , তারা কি চেয়ে চেয়ে দেখবে, না কুড়াল ধারীদের হাতকে চেপে ধরে জাহাজ ছিদ্র করা থেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করবে ?"** (রাসূলুল্লাহ্ সাঃ) এই হাদীস দ্বারা বুঝাতে চান যে, সমাজের মধ্যে দু'শ্রেণীর লোক থাকবে। এক শ্রেণীর লোক হলো কুড়াল হাতে নিয়ে জাহাজ ছিদ্র করে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস কারীর মতো অন্যায়, অপকর্ম এবং পাপাচারে লিপ্ত থেকে সমাজ ধ্বংসকারী লোক। আর অপর শ্রেণীর লোক হলো দ্বোতলার আরোহীদের মতো। যারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে অর্থাৎ নেককার, পরহেজগার এবং ভাল মানুষ হিসেবে মনে

করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) দৃষ্টিতে এরা উভয়ই একই রকম অপরাধী। নীচ-তলার আরোহীদেরকে যদি দোতলার আরোহীরা জাহাজ ছিদ্র করা থেকে বাধা না দেয়, তাহলে যেমন জাহাজ পানিতে নিমজ্জিত হয়ে নীচতলার লোকেরা যেমন ধ্বংস হয়ে যাবে, তেমনি দোতলার লোকেরাও তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। অনুরূপ ভাবে সমাজ ধ্বংসকারী বদকার, অপরাধী, পাপাচারী লোকেরা যেমন আল্লাহর গযবে-আযাবে ধ্বংস হয়ে যাবে তেমনি ভাল মানুষের দাবীদারেরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে জাহাজকে সমাজের সাথে তুলনা করেছেন। জাহাজের নীচতলার লোকদেরকে সমাজের মধ্যে পাপাচার, বদকার লোকদের সাথে তুলনা করেছেন এবং দোতলার ভদ্র লোকদেরকে সমাজের নেককার, পরহেজগার ভাল মানুষের দাবীদারদের সাথে তুলনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাঃ) এই উদাহরণ দ্বারা সাহাবাদের মাধ্যমে গোটা উম্মতকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন।

সমাজের মধ্যে যারা নিজেদের বড় বুযর্গ পরহেজগার বলে মনে করে, অথচ যারা অপরাধ করে পাপাচারে লিপ্ত থাকে তাদেরকে বাধা দেয় না। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) তাদেরকে বেশী অপরাধী বলে উল্লেখ করে বলেনঃ 'একদা আল্লাহ্ পাক এক যালেম, পাপাচারী ও দূর্বৃত্ত জাতিকে ধ্বংস করার জন্য ফেরেশতা পাঠালেন। কিন্তু ফেরেশতা সেই জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র যিকির-আযকারে লিপ্ত কিছু বুযর্গ ব্যক্তিকে দেখে ধ্বংস না করে ফিরে গেলেন। আল্লাহ্ তার কাছে জানতে চাইলেন সেই জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে কি না ? উত্তরে ফেরেশতা বললেনঃ হে রাব্বুল আলামীন! সেই দূর্বৃত্ত জাতির মধ্যে তোমার এমন কিছু বুযর্গ বান্দা বসবাস করেছে যাদের বুযর্গানী দেখে আমি আর সেই জাতিকে ধ্বংস করতে পারিনি ফিরে এসেছি। আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি আগে সেই বুযর্গ ব্যক্তিদের ধ্বংস করবে। তার পর জাতির অন্যদেরকে ধ্বংস করবে। কেননা তারা নিজেরা যিকির আযকার এবং এবাদত বন্দেগী করেছে কিন্তু জাতির অন্যদেরকে দাওয়াত দেয়নি এবং অপরাধ, পাপাচার থেকে মুক্ত করার জন্য কোন জিহাদ চেষ্টা-তদবীর করেনি। সুতরাং তারাই বড় অপরাধী। তাদের এবাদত-বন্দেগী এবং বুযর্গানী আমার কাছে কোন মূল্য নেই। (খোৎবাতুল আহকাম)।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আমরা যদি আমাদের সমাজের দিকে একবার চোখ বুলায় তাহলে উপরোক্ত হাদীসের মতো একই অবস্থা দেখতে পাই। এক শ্রেণীর

লোক সকল প্রকার অন্যায়, অপকর্ম এবং পাপাচারে লিপ্ত থেকে সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর এক শ্রেণীর লোক নিজেকে আল্লাহ্‌র অলী-পীর, বুযর্গ, পরহেজগার, নেককার বান্দা সেজে এবং সমাজের ফেৎনা-ফাসাদ থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করে মসজিদে-খানকায় বসে বসে তাসবীহ্, তাহলীল এবং যিকির আয্‌কারে ব্যস্ত থেকে সওয়াবের হেসাব কসছে। এরা কি হাদীসে বর্ণিত জাহাজের দোতলা আরোহীদের মতো নয় ? এরা কি দুর্বৃত্ত সমাজের মধ্যে যিকির আযকারে ব্যস্ত আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত বুযর্গ বান্দার মতো নয় ?

অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম না করার জন্য তাদের উপর যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গযব-আযাব এবং দুঃশাসন চেপে বসবে তখন তা থেকে বাঁচার জন্য ঐ বুগর্য নেককার লোকেরা দোআ করলে কি আল্লাহ্ তাআলা তাদের সেই দোআ কবুল করবেন না ছুড়ে ফেলবেন ? অথচ সমাজ আজ অন্যায়, অপকর্ম, জেনা-ব্যভিচার, হত্যা-ধর্ষণ, রাহাজানি থেকে শুরু করে যত প্রকার পাপাচার অপরাধ আছে যা আইয়্যামে জাহেলিয়াতকেও ছাড়িয়ে গেছে। সেই সমাজকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে, অন্যায়-অপরাধকে প্রতিরোধ না করে বরং এক শ্রেণীর লোক মসজিদে মসজিদে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সওয়াবের হেসাব কসছে। খানকায় ও পীরের দরবারে বসে যিকির-আয্‌কার এবং তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীলে মশগুল আছে। আর এর কারণে যদি আল্লাহর গযব, শাস্তি নামে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য হাজারো দোআ করতে থাকে তাহলে হাদীস অনুযায়ী তাদের দোআ তো কবুল হবেই না বরং আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সমাজের অপরাধী, পাপাচারী, যালেমদের দলভুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তাআলা তো কেবলমাত্র তাদেরকেই দুনিয়া এবং আখেরাতে নাযাত দেবেন যারা تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ **নেক কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বাধা দেবে**। অর্থাৎ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য আত্মনিয়োগ করবে। চেষ্টা তদবীর করবে। নিজের জান-মাল দিয়ে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

কুরআন-হাদীসে দুনিয়া এবং আখেরাতে বাঁচার উপায় জিহাদ ছাড়া আর বিকল্প কোন পথ দেখা যায় না। যারা একাজ না করবে তাদের মৃত্যু মুনাফেকের মৃত্যু

বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ- (مُسْلِمٌ)

যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো অথচ জীবনে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন করলো না এমনকি ইসলামী আন্দোলন করার চিন্তাও (পরিকল্পনা) করলো না। সে যেন মুনাফেকীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো (মুসলিম)

আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে এই করুণ মৃত্যু থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব শিক্ষনীয় বিষয় পাওয়া গেল তা হলো ঃ

✪ সকল অবস্থায় নিজে ন্যায় ও নেকীর কাজ করতে হবে এবং অন্যদেরকে ন্যায় ও নেকীর কাজ করার আদেশ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে হবে।

✪ সকল সময় এবং সকল অবস্থায় নিজে অন্যায়, অপকর্ম এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং অন্যদেরকেও অন্যায়, অপকর্ম ও পাপ কাজ থেকে বারণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিরোধ গড়ে তোলতে হবে।

✪ এ কাজ একাকী করা সম্ভব নয়। সুতরাং জামায়াতবদ্ধ হয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

✪ যারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের কাজ করে না তারা নিজেদেরকে যতই নেককার এবং ভাল মানুষ মনে করুক না কেন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সমাজ বিদ্বংসী অপরাধী থেকে তাদের কোন পার্থক্য নেই।

✪ সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন। এই জন্য জামায়াত বা দলবদ্ধ হয়ে নিজের জান এবং মাল দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ বা আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

✪ দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচার জন্য অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

✪ সমাজে অন্যায়, অপকর্ম এবং পাপাচার নির্বিঘ্নে চালু থাকা অবস্থায় কেউ যদি আল্লাহ্‌র কাছে এই গযব-আযব থেকে বাঁচার জন্য দোআ করে তাহলে আল্লাহ্ তাআ'লা তার দোআকে কবুল করবেন না বরং প্রত্যাখ্যান করবেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র আযাব থেকে মুক্তি এবং দোআ কবুলের একমাত্র উপায় হলো ন্যায় কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে বাড়াবাড়ি এবং ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর হাদীস থেকে আমরা যেসব শিক্ষণীয় বিষয় জানতে পারলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভয় জগতে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। মাআস সালাম।

তিন

জামায়াতবদ্ধ জীবন-যাপনের গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ-بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِيْ بِهِنَّا
بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ
خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ اِلَّا اَنْ يَّرْجِعَ-وَمَنْ دَعَا
بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَمِنْ جُثٰىءِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ
وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ-(اَحْمَدْ تِرْمِزِىْ)

অনুবাদ ঃ হযরত হারেসুল আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্ আমাকে যে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলো ঃ ১) জামায়াত বা দলবদ্ধ হবে। ২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শোনবে। ৩) তার আদেশ মেনে চলবে। ৪) হিযরাত করবে এবং ৫) আল্লাহ্র পথে জেহাদ করবে। যে ব্যক্তি জামায়াত বা সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন নিজের কাঁধ থেকে ইসলামের রশি বা বাঁধন খুলে ফেললো। যতক্ষণ না সে সংগঠনে ফিরে আসবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দেবে, সে জাহান্নামের জ্বালানী হবে। যদিও সে রোজা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। (আহ্মদ, তিরমিযী)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ -থেকে বা হতে। قَالَ -বলেন বা বলেছেন। اَنَا- আমি। اٰمُرُكُمْ -তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি। خَمْسٍ -পাঁচ। اَمَرَنِىْ -আমাকে আদেশ করা হয়েছে। بِالْجَمَاعَةِ -জামায়াতের বা সংগঠনের। -وَ -এবং। اَلسَّمْعِ -শোনার। وَالطَّاعَةِ -এবং আনুগত্যের। وَالْهِجْرَةِ- এবং হিজরাত বা পরিত্যাগের। وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের। وَاِنَّهٗ -এবং নিশ্চয় উহার। مَنْ -যে কেউ। خَرَجَ -বের হলো বা বের হয়ে গেল বা দূরে সরে গেল। مِنَ الْجَمَاعَةِ -জামায়াত বা সংগঠন থেকে। -قِيْدَ شِبْرٍ -এক বিঘত বা অর্ধ হাত পরিমাণ। فَقَدْ خَلَعَ -অতঃপর সে খুলে ফেললো বা মুক্ত হয়ে গেল। ربقة اَلْاِسْلَامِ -ইসলামের রজ্জু বা বন্ধন। -مِنْ -থেকে বা হতে। عُنُقِهٖ -তার ঘাড় বা গলদেশ। اِلَّا -ছাড়া এখানে যতক্ষণ না। -اَيْرْجِعَ -সে ফিরে আসলো বা আসবে। -وَمَنْ--এবং যে কেউ। -دَعَا--ডাকা বা আহবান করা। اَلْجَاهِلِيَّةِ -জাহেলিয়াত বা মূর্খতা। فَهُوَ -অতঃপর সে হবে। جُثَىءِ جَهَنَّمَ -জাহান্নামের ইন্ধন বা জ্বালানী। وَاِنْ-এবং যদিও। صَامَ -সে রোজা রাখে। وَصَلّٰى -এবং নামায পড়ে। -وَزَعَمَ -এবং দাবী করে বা মনে করে। اَنَّهٗ مُسْلِمٌ -নিশ্চয় সে মুসলমান।

সম্বোধন ঃ প্রিয় দ্বীনি/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে দারসে হাদীস পেশ করার জন্য বিশিষ্ট বর্ণনাকারী হারেসুল আশআরীর বর্ণিত জামায়াত বা সংগঠনের গুরুত্ব সংক্রান্ত হাদীস পাঠ এবং অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্‌পাক যেন আমাকে হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তাওফীক দান করেন। আমীন।

হাদীসটি বর্ণনার সময়কাল ঃ যদিও আল কুরআন নাযিলের মতো হাদীস

বর্ণনার সময়কাল নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তার পরেও হাদীসের বিষয়বস্তু দেখে মনে হয় হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাদানী জীবনে বর্ণনা করেছেন। তার কারণ হলো হাদীসের সর্বশেষে উল্লেখ রয়েছে যদিও সে রোজা রাখে এবং নামায পড়ে। নামায মাক্কী জীবনের শেষের দিকে ফরজ হলেও রোজা ফরজ হয়েছে মাদানী জীবনের প্রথম দিকে অর্থাৎ হিজরাতের প্রায় এক-দেড় বছর পরে। অতএব বলা যায় হাদীসটি মাদানী জীবনে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। তার পরেও আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।

হাদীসের কেতাব দু'টির পরিচয় ঃ উল্লেখিত হাদীসটি অত্যন্ত সুপরিচিত দু'টি বিশুদ্ধ কিতাব ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের 'আহমদ' এবং ইমাম তিরমিযীর 'তিরমিযী' কিতাবে স্থান পেয়েছে। আহমদ এবং তিরমিযীর হাদীস বিশুদ্ধ হলেও তিরমিযী শরীফ 'সেহাহ্ সেত্তাহ' কেতাবের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু 'আহমদ' এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে পঠিত হাদীসটির অনুবাদ সহ প্রাথমিক কিছু পরিচয় তুলে ধরলাম। এখন আমি হাদীসটির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি।

اَنَا اَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ আমি তোমাদেরকে আদেশ করছি পাঁচটি জিনিসের বা কাজের যে পাঁচটি কাজের নির্দেশ আল্লাহ্ আমাকেও করেছেন।

এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) **আল্লাহ্ আমাকে যে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।** এই রিফারেন্স এই জন্যই টেনেছেন যে যাতে করে উম্মতে মুহাম্মদী তার গুরুত্ব বেশী বেশী উপলব্ধি করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়।

মূলতঃ নিম্নের পাঁচটি কাজ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মুখ দিয়ে বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে কথাগুলো আল্লাহ্ তাআ'লার। যাকে হাদীসের পরিভাষায় **হাদীসে কুদুসী** বলা হয়।

প্রিয় ভায়েরা বোনেরা! এখন আমি আপনাদের সামনে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশগুলো পর পর আলোচনা করছি–

এক. بِالْجَمَاعَةِ জামায়াত বা সংগঠনভূক্ত থাকবে। অর্থাৎ জামায়াত বা সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করবে। হাদীসের এই নির্দেশ মতে সর্বপ্রথম যে

গুরুত্বপূর্ণ কাজটি উম্মতে মুহাম্মদিকে করতে হবে তা হলো জামায়াত বা সংগঠনভুক্ত থাকা। এটা একটা মুসলমানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যার সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত উমরে ফারুক (রাঃ) বলেন ঃ لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ **জামায়াত বা সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই।** অর্থাৎ জামায়াত বা সংঘবদ্ধ জীবন যাপন ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

মহান আল্লাহ্ পাক কালামে হাকীম সূরা আলে ঈমরানের ১০৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا-

তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু তথা দ্বীন ইসলামকে জামায়াতবদ্ধ হয়ে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না। সুতরাং দ্বীন ইসলামের উপর টিকে থাকতে হলে এবং দ্বীন ইসলামকে কায়েম করতে হলে জামায়াতবদ্ধ হয়েই করতে হবে, বিকল্প কোন পথে নয়।

জামায়াতবদ্ধ বা সংগঠনভুক্ত থাকা একজন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব এবং কর্তব্য। যদি সে তার এই দায়িত্ব না পালন করে তবে তার পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহানবী (সাঃ) অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ

فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ

জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকা তোমাদের কর্তব্য। কেননা পাল হতে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে নেকড়ে বাঘ সহজেই খেয়ে ফলে। অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ দলছুট ছাগলকে যেমন সহজেই খেয়ে ফেলে, তেমনি জামায়াত বহির্ভূত ব্যক্তিকে শয়তান সহজেই তার জালে আবদ্ধ করে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়।

এই জামায়াত বা সংগঠন বলতে আমাদের সমাজে পাড়ায়-মহল্লায় এবং গ্রামে গঞ্জে যে জামায়াত আছে সেই জামায়াত বা পঞ্চায়েত নয়। এই জামায়াত হলো ইসলাম পালন এবং প্রতিষ্ঠার জন্য যে জামায়াত বা সংগঠন তাকেই বুঝান হয়েছে। পাড়া-মহল্লার জামায়াত হলো একটা সামাজিকতা, এতে কিছু সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়া যায় মাত্র।

দুই. اَلسَّمْعُ। নেতার আদেশ মন দিয়ে শোনাবে। একটি জামায়াত বা সংগঠনের দু'টা পার্ট বা অংশ থাকে। একটা পার্ট হলো নেতা এবং অপর পার্ট

হলো কর্মী বাহিনী। সংগঠনের দ্বিতীয় পার্ট বা অংশের অর্থাৎ কর্মী বাহিনীর যে কাজ হবে তা হলো সংগঠনের আমীর বা দায়িত্বশীলের কথা বা নির্দেশকে ভালভাবে মন দিয়ে শ্রবণ করা। কেননা নেতা যা নির্দেশ করবে তা যদি ভাল ভাবে মন দিয়ে শোনা না হয়, তা হলে নেতার সেই নির্দেশটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। অথবা কিছু হলেও পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হয় না।

সুতরাং নেতার কোন কথা বা নির্দেশকে সুন্দর-এবং সূচারুরূপে বাস্তবায়ন করতে হলে নেতার নির্দেশটি পালন করার আগে তার কথা বা নির্দেশ ভাল ভাবে মন দিয়ে শোনতে হবে। প্রয়োজনে বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে যাচাই-বাচাই করে নিয়ে ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। তারপর সেই কাজটি আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে। এটা হলো ইসলামী আন্দোলন বা সংগঠনের কর্মীদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা কর্তব্য।

তিন. وَالطَّاعَةِ এবং নেতার আনুগত্য করবে বা আদেশ মান্য করবে। অত্র হাদীসের তিন নম্বরে এই নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংগঠনের কর্মী বাহিনীর নেতার নির্দেশ.মন দিয়ে শোনার পর দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে তা হলো সেই নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করা। নেতার কথা বা নির্দেশ মন দিয়ে শ্রবণ করে থেকে গেলেই চলবে না। বরং সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আর একেই বলা হয় এতায়া'ত বা আনুগত্য।

ইসলামী সংগঠন বা আন্দোলনের কর্মীদের আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। সংগঠন বা আন্দোলনের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আনুগত্য হচ্ছে অপরিহার্য শর্ত। তাই আল্লাহ্ পাক মুমিনদেরকে আনুগত্যের তাগাদা দিয়ে সূরা নিসা-এর ৫ম নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের নেতা বা দায়িত্বশীলের আনুগত্য করো। এই আয়াতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে আল্লাহ্ এবং রাসূলের নির্দেশের আনুগত্য বিনা শর্তে করতে হবে এবং اُوْلِي الْاَمْرِ বলে আমীর বা নেতার আনুগত্য শর্তসাপেক্ষে করতে হবে। কেননা নেতার আনুগত্য হবে কেবল উত্তম এবং নেক-কল্যাণকর কাজের

ক্ষেত্রে। কোন অন্যায় বা পাপের কাজে অথবা নেতার কোন খামখেয়ালী কাজের আনুগত্য করা যাবে না। এই সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলেন ঃ

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ-

নেতার নির্দেশ শোনা ও মানা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সে নির্দেশ তার মন মতো হোক আর না হোক। তবে এই শর্তে যে, তা যেন আল্লাহ্‌র নাফরমানীমূলক কাজের জন্য না হয়। আর যখন কোন নাফরমানীমূলক কাজের আদেশ তাকে দেয়া হবে তখন তা শোনাও যাবে না এবং মানাও যাবে না। (বুখারী মুসলিম)

চার. وَالْهِجْرَةِ এবং হিজরাত করবে। রাসূলের চতুর্থ নম্বর যে নির্দেশ তা হলো প্রয়োজনে হিজরাত করা।

হিজরাত অর্থ ঃ هِجْرَةٌ আরবী শব্দটির অর্থ হলো ত্যাগ করা। এর দ্বারা মুহাদ্দীসগণ দু'টো অর্থ করেছেন।

i) هِجْرَةٌ (হিজরাত) অর্থ–আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করা। বুখারী শরীফে এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে–

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ

মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে। তাছাড়া একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– مَا الْهِجْرَةُ اَفْضَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ **হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) কোন হিজরাত উত্তম?** প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ اَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ

তোমার রব যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ করাই হলো উত্তম হিজরাত। এটি হলো হিজরাতের ব্যাপক অর্থ যা কেবলমাত্র একটি কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

ii) هِجْرَةٌ (হিজরাত) এর দ্বিতীয় অর্থ কেউ কেউ নিয়েছেন দেশ ত্যাগ। আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে প্রয়োজনে নিজের দেশ ত্যাগ করা। এ হিজরাতের তখনই সুযোগ আছে যখন আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলার কোন সুযোগই থাকেনা। তবে এই হিজরাত হতে হবে বিশুদ্ধ নিয়্যাতে, দুনিয়ার কোন সুযোগ-সুবিধার জন্য নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেছিলেন।

সুতরাং হাদীসে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চতুর্থ যে নির্দেশ তা হলো আল্লাহ্ যা অপছন্দ করেন, তিনি যা হারাম করেছেন, যে কাজ এবং কথা থেকে বারণ করেছেন তা পরিহার করা। আর জামায়াতবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সব পরীক্ষা আসবে তার মধ্যে একটা হলো হিজরাত বা দেশ ত্যাগ। ফলে প্রয়োজন হলে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দ্বীন পালনের উদ্দেশ্যে নিজের দেশ বা বাড়ি-ঘর ত্যাগ করা।

পাঁচ. وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসে পঞ্চম যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা। আন্দোলন-সংগ্রাম করা।

আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল সর্বশেষ যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালনের জন্য উপরে উল্লেখিত চারটি জিনিসের প্রয়োজন হয়। যেমন–

আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের। আর আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন জামায়াত বা সংগঠনের। আর সংগঠন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন আমীর বা নেতার এবং একদল সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনীর। সেই কর্মী বাহিনী সংগঠনের নেতার কথা বা নির্দেশকে মন দিয়ে শোনবে এবং সেই অনুযায়ী আনুগত্য করবে, কাজ করবে। আর দ্বীন কায়েমের স্বার্থে প্রয়োজনে হিজরাত করবে।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ বা ইসলামী আন্দোলন করা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। কেননা যে সমাজ বা রাষ্ট্র ইসলামী আইন বা বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত হয় না, সেই সমাজে একজন মুমিন চুপ করে বসে থাকতে পারে না। এতে তার ঈমানের দাবী পূর্ণ হয় না। ঈমানের প্রথম এবং প্রধান দাবীই হলো দ্বীন তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জানমাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

করা। কেননা এটা হলো সব ফরজের বড় ফরজ। তার কারণ জিহাদের এই ফরজটি পালন করতে পারলে অন্যান্য ফরজগুলো পালন করা সহজ হয়ে যায়। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর কথা আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে এবং রাসূল (সাঃ) হাদীসে অসংখ্য জায়গায় উল্লেখ করে এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্র হাদীসে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ

وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ- اِلَّا اَنْ يَّرْجِعَ

আর যে কেউ জামায়াত বা সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত বা অর্ধ হাত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন তার গলদেশ থেকে ইসলামের রশি বা বাঁধন খুলে ফেললো। যতক্ষণ না সে সংগঠনে ফিরে আসবে।

এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। জামায়াতভুক্ত জীবন যাপন এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ইসলামের মধ্যে থাকা না থাকা এরই উপর নির্ভর করে। যদি কেউ জামায়াত বা ইসলামী সংগঠন থেকে দূরে সরে যায় তাহলে সে ইসলামের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ সে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ব্যবস্থা হিসেবে বলেন ঃ

مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّفَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الْجَمَاعَةِ وَهِىَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ-

কোন জামায়াত বা সংগঠন ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এর ঐক্য বিছিন্ন করতে চায়, তার চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করো অর্থাৎ হত্যা করো। সে যেই হোক না কেন। (মুসলিম)

হত্যা তো তখনই করা যায় যখন সে মুরতাদ তথা ইসলাম ত্যাগকারী হয়ে যায়। সুতরাং জামায়াত ত্যাগকারী বা ভাঙ্গার চেষ্টাকারী হলো ইসলাম ত্যাগকারী। অতএব তার শাস্তিই হলো তাকে হত্যা করা। তবে এই জামায়াত বলতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জামায়াতকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জামায়াত ছিলো الجماعة। (আল জামায়াত) বা একমাত্র জামায়াত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ওফাতের পর আর কোন একক জামায়াত

নেই। সমাজে জামায়াত বা ইসলামী দল একাধিক থাকতে পারে। সুতরাং যে কোন মুসলমান যে কোন জামায়াত বা ইসলামী সংগঠনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তবে শর্ত হলো সেই জামায়াতের লক্ষ উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। বর্তমানে আমাদের দেশে যে জামায়াত বা ইসলামী দল আছে তার কোনটিই একক বা একমাত্র জামায়াত নয়। তবে যে দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্ দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন এবং কর্মসূচী হবে রাসূল (সাঃ)-এর কর্মসূচীর অনুরূপ। কেবলমাত্র সেই দলের অন্তর্ভুক্ত থেকেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এই জন্য অবশ্য তাকে দল বাছাই করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তবে হ্যাঁ একাধিক ইসলামী দলের বাহানা দিয়ে সংগঠন থেকে দূরে থাকা যাবে না। কোন না কোন ইসলামী জামায়াত বা সংগঠনের সাথে তাকে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। জামায়াত বা সংগঠন ত্যাগ করা তখনই যাবে যখন দেখা যাবে যে আমি যেই সংগঠনে আছি সেই সংগঠনের চেয়ে কুরআন সুন্নাহ্ এবং কৌশলের দিক থেকে অন্য একটি সংগঠন উত্তম। কেবল মাত্র তখনই স্বীয় দল ত্যাগ করে সেই উত্তম দলে যাওয়া যাবে। সুতরাং মুসলমানিত্ব রক্ষা করতে হলে তাকে অবশ্যই কোন না কোন একটা ইসলামী সংগঠনের মধ্যে সংপৃক্ত থাকতে হবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জাহান্নামী 'দায়ী' (আহবানকারীদের) কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىِّ جَهَنَّمَ.

আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দেবে সে জাহান্নামের জ্বালানী হবে।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে জাহেলী বা তাগুতি মতবাদের দিকে আহবান কারীর পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেনঃ যে ব্যক্তি জাহেলি দল বা মতবাদের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেবে, ডাকবে বা আহবান জানাবে সে জাহান্নামী হবে। আল্লাহ্‌র মতবাদ বা নিয়ম-নীতি ছাড়া আর যতো মতবাদ বা নিয়ম-নীতি আছে সবই জাহেলী মতবাদ বা নিয়ম-নীতি। তা যে নামেই ডাকা হোক না কেন। চাই তা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ হোক, পুঁজিবাদ অথবা ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ হোক বা জাতীয়তাবাদই হোক। সকল মতবাদই হলো জাহেলী মতবাদ বা তাগুতি মতবাদ। এগুলো সবই মানব রচিত তাগুতি

মতবাদ। কেননা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে দুটো দল রয়েছে। একটা হলো حِزْبُ اللّٰهِ।- আল্লাহ্র দল এবং অন্যটা হলো حِزْبُ الشَّيْطٰنِ। বা শয়তানের দল।

সুতরাং যে কেউ জাহেলী তথা তাগুতি মতবাদ বা নিয়ম-নীতির দিকে মানুষকে দাওয়াত দেবে, সেই মতবাদে নিজে জড়িত থাকবে এবং প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে, সে জাহান্নামের জ্বালানী হবে অর্থাৎ জাহান্নামী হবে।

পবিত্র কালামে হাকীমে সর্বোউত্তম দাওয়াতের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنَ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

তার কথা অপেক্ষা আর কার কথা উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত বা আহবান করে, নিজে সৎ কাজ করে এবং বলে আমি একজন মুসলমান ? (হা-মীম,সীজদাহ্-৩৩)

অত্র আয়াতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়া বা ডাকা হলো সর্বউত্তম কথা। আর এটাই হলো একজন মুমিনের সর্বোত্তম কথা ও কাজ। এরাই সৎ এবং নেক কাজ করতে পারে। আর এরাই একমাত্র মুসলমানের দাবীদার হতে পারে, অন্য কেউ নয়। হাদীসের সর্বশেষ অংশে বলা হয়েছে-

وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ-

আর যদিও সে রোজা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবী করে।

হাদীসের সর্বশেষ অংশে বলা হয়েছে যারা জাহেলিয়াত বা শয়তানী মতবাদ এবং নিয়ম-নীতির দিকে দাওয়াত দেবে, জাহেলী মতবাদের সাথে জড়িত থাকবে, তারা জাহান্নামী হবে। যদিও এসব লোক রোজার মাসে রোজা রাখে, নিয়মিত নামায পড়ে এবং নিজেকে দাবী করে মুসলমান বলে।

অত্র হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, যারা জাহেলী মতবাদ তথা শয়তানী দলে জড়িত থেকে সেই দলের মতবাদ বা নিয়ম-নীতিকে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে এবং অন্যদেরকেও সেই দলে অংশগ্রহণের আহবান করে। অথচ তারা নামায পড়ে, রোজা রাখে এবং মুসলমানের দাবীও করে, এদের সব কিছুই বিফল।

আসলে তাদের এসব কাজ এবং দাবী কোন কল্যাণে আসবে না। এসব আ'মল এবং দাবী আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্য নেই। যেহেতু তারা কুফরী মতবাদের সাথে জড়িত।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আমাদের সমাজে অসংখ্য রোজাদার, নামাযী, নামধারী মুসলমান আছে যারা জীবনভর জাহেলী তথা মানব রচিত মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এমন, মার খাচ্ছে, জ্বেল-জুলুম-নির্যাতন ভোগ করছে। অনেক ত্যাগ কুরবানীও করছে। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের এই নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, নেক কাজ, ত্যাগ-কুরবানী এবং যুলুম-নির্যাতন ভোগ আল্লাহ্‌র কাছে কি কোন মূল্য আছে ? তাদের মুসলমানিত্বের এই অসার দাবী কি আল্লাহ্‌র কর্ণপাত হবে ? আসলে সবই বিফলে যাবে। তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ্‌র অসন্তোষ এবং জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। আল্লাহ্‌র কাছে তো কেবলমাত্র তাদেরই নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, নেক আমল গ্রহণযোগ্য হবে। জেল-জুলুম- নির্যাতন ভোগ এবং ত্যাগ-কুরবানী তো কেবল তাদেরই আল্লাহ্‌র কাছে মূল্য আছে। মুসলমানিত্বের দাবী তো কেবলমাত্র তারাই করতে পারে, যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে তথা আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেয়, নিজেরাও সেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থাকে এবং জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে, সংগ্রাম-লড়াই করে। এসব আমলের অধিকারীদের জন্যই রয়েছে সফলতা। এদের জন্যই রয়েছে পরিত্রাণ। এদের জন্যই রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তোষ এবং অফুরন্ত নিয়ামতে ভরা জান্নাত। যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে অত্র হাদীসের যে ব্যাখ্যা-পেশ করা হলো তা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা হলো–

✪ হাদীসে রাসূলের এই নির্দেশকে আল্লাহ্‌রই নির্দেশ মনে করতে হবে।

✪ দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রতো একটা উত্তম জামায়াত বা দলের সাথে জড়িত থাকতে হবে এবং মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সেই দলে টিকে থাকতে হবে।

✪ সংগঠন বা দলের যিনি আমীর বা দায়িত্বশীল থাকবেন তার কথা বা নির্দেশ ভাল ভাবে মন দিয়ে আন্তরিকতার সাথে শোনতে হবে। প্রয়োজনে বুঝতে না পারলে বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে।

✪ আমীর বা দায়িত্বশীলের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে এবং তার আনুগত্য করতে হবে। তার আদেশ মন দিয়ে শোনার পর সে অনুযায়ী কাজটা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে।

✪ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের আদেশকে বিনা শর্তে প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নিতে হবে। তবে আমীর বা দায়িত্বশীলের আদেশ শর্ত সাপেক্ষে মানতে হবে। কেবলমাত্র মা'রুফ বা উত্তম ও কল্যাণকর কাজের ক্ষেত্রে নির্দেশ মানতে হবে। ব্যক্তির খামখেয়ালী এবং নাফরমানীমূলক কোন কথা বা নির্দেশ শোনা যাবে না এবং মানাও যাবে না।

✪ হারাম এবং নিষিদ্ধ সকল আ'মল বা কাজ পরিহার করে চলতে হবে। এম-নকি যদি কাজে কোন সন্দেহ থাকে তাও পরিত্যাগ করতে হবে। এটা হবে তাকওয়ার গুণ।

✪ আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি দ্বীন পালনের কোন পরিবেশ বা সুযোগ না থাকে তা হলে একমাত্র দ্বীনের স্বার্থে প্রয়োজনে ঘর-বাড়ী অথবা দেশ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

✪ আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলনে জড়িত থেকে সর্বাতক ত্যাগ ও কুরবানী করতে হবে।

✪ ইসলামী সংগঠন থেকে যেমন নিজে বের হতে পারবে না, তেমনি অন্যকেও বের করার জন্য চেষ্টা করা যাবে না এবং সংগঠনের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না।

✪ ইকামাতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত যদি কোন দল বা সংগঠনের কার্যক্রম নিজের দলের থেকে উত্তম দেখা যায় তাহলেই কেবলমাত্র নিজের দল ত্যাগ করে সেই দলে যোগ দেয়া যাবে। তবে যাচাই এর যোগ্যতা থাকতে হবে।

✪ যেই দলের মধ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কোন কর্মসূচী নেই এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নেই। বরং দুনিয়ায় যাদের টার্গেট। এমন কোন দল বা সংগঠনের সাথে জড়িত থাকা যাবে না। সেই দলের দিকে অন্যদের ডাকা যাবে না এবং সেই দলকে সাহায্য-সহযোগীতাও করা যাবে না। সে দল যে নামেই হোক না কেন।

✪ নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, নেক আ'মল আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য তখনই হবে এবং মুসলমানিত্বের দাবী তখনই করা যাবে, যখন তার কার্যক্রম এবং মানুষকে ডাকার কাজ আল্লাহ্র দিকে হবে। আর কেবলমাত্র তখনই জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন বাড়াবাড়ি বা ভুল হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এই হাদীসটি থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি।

চার

দান কারীর প্রতিদান এবং কৃপণব্যক্তির পরিণতি ঃ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ- وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ- وَالْجَاهِلُ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ- (ترمزى)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ দাতা বা দানকারী আল্লাহ্‌র নিকটতম, বেহেশতের নিকটতম এবং মানুষের নিকটতম হয়ে থাকে। আর দূরে থাকে জাহান্নাম থেকে। অপর পক্ষে কৃপণ ব্যক্তি দূরে থাকে আল্লাহ্ হতে, বেহেশত হতে এবং মানুষ হতে। আর জাহান্নামের নিকটে থাকে। অবশ্য অবশ্যই একজন জাহেল দাতা একজন বখিল আবেদের তুলনায় আল্লাহ্‌র কাছে বেশী প্রিয়। (তিরমিযী)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ –হতে বা থেকে। قَالَ –বলা বা বলেছেন। اَلسَّخِىُّ –দাতা বা দানকারী। قَرِيْبٌ –নিকটতম বা নিকটবর্তী। مِنْ –হতে বা থেকে। اَلنَّاس –মানুষ। بَعِيْدٌ –দূরে। و –এবং। بَخِيْلٌ–বখিল বা কৃপণ। اَلْجَاهِلُ- মূর্খ। احب প্রিয়। اِلٰى –দিকে বা কাছে। عَابِدٍ- আবেদ বা ইবাদাতকারী।

সম্বোধনঃপ্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে দারসে হাদীস পেশ করার জন্য বিশিষ্ট সাহাবী ও রাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি পাঠ ও অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্‌ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তাওফীক দান করেন। আমীন।

হাদীসটি বর্ণনার সময়কাল ঃ হাদীসটি বর্ণনার সময়কাল সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। তার পরেও হাদীসটির বিষয়বস্তু দেখে মনে হয় বর্ণনার সময়কাল মাদানী জীবনে হতে পারে। কেননা মাদানী জীবনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর হাতে সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব ছিলো। তাছাড়া যুদ্ধ-জিহাদও তিনি সেখান থেকেই পরিচালনা করেছিলেন। সামাজিক অধিকার হিসেবে এবং যুদ্ধ জিহাদ পরিচালনার জন্য তিনি দানের ব্যাপারে বেশী বেশী তাগাদা দিতেন। সুতরাং এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মাদানী জীবনে বর্ণনা করেছিলেন। তার পরেও আল্লাহ্‌ পাকই ভাল জানেন।

রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ নাম– আবদুর রহমান। **বংশীয় নাম–** আবদি শামস (অরুণ দাস)। লকব বা পদবী নাম– আবু হুরাইরা। **পিতার নাম–** আমের বিন আবদে জিশ্‌শারা। তিনি দাওস গোত্রের ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন। আবু হুরাইরা মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু হুরাইরার নামকরণ সংক্রান্ত অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ বলেন যে, তিনি ছোট থেকে বিড়াল খুব ভাল বাসতেন এজন্য তার সঙ্গী-সাথীরা আবু হুরাইরা (বিড়াল ওয়ালা) বলে ডাকতো। সহীহ বুখারীতেও বর্ণিত আছে যে, নবী (সাঃ) বিড়াল ভালবাসার কারণে তাকে আবুহার বা আবু হুরাইরা বলে ডাকতেন। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) আসহাবে সুফ্‌ফার একজন সদস্য এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর সার্বক্ষণিকের সাথী ছিলেন। তিনি কয়েকবার মদীনার গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসন আমলে মাঝে-মধ্যে ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫,৩৭৪টি। তিনি সর্বাধিক হাদীসের বর্ণনাকারী ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে হাদীসটির প্রাথমিক ধারণা পেশ করলাম। এখন প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ-بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ

দাতা বা দানকারী আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী , জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দুরে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসের এই অংশে সাখী বা দানকারীর মর্যাদা এবং অবস্থান উল্লেখ করেছেন।

اَلسَّخِيُّ (সাখীর) অর্থ দাতা বা দানকারী। যার হাত খোলা, যিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার সেবার জন্য মুক্ত হস্তে দান করেন। যিনি অন্যায় পথে খরচ করেন না। যিনি অপচয় অপব্যয় করেন না। যেই কাজে কোন কল্যাণ এবং উপকার নেই, যেই দানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নেই, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি দান করেন না। পক্ষান্তরে যেই কাজে মানুষের কল্যাণ এবং উপকার আছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে খরচ করতে তিনি দ্বিধা করেন না। যিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কাজে দ্বিধা-সংকোচহীন ভাবে মুক্ত হস্তে দান করেন। এক্ষেত্রে তিনি কোন কার্পণ্য করেন না। দুনিয়ার কোন মোহ্ এবং শয়তানী কোন অস্ওয়াসাও তাকে দান করা থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি.করতে পারে না। যিনি কত দান করলেন বড় করে দেখার জন্য বার বার তা গুনে গুনে দেখেন না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَنْفِقْ وَلاَ تُحْصِىَ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكَ

তুমি খরচ করো, কত খরচ করলে তা বড় করে দেখার জন্যে হেসাব কসতে যেও না, তাহলে আল্লাহ্ও তোমার বিপক্ষে হেসাব কসবেন । (বুখারী মুসলিম)

তিনি এমনই সাখী, যিনি দান বন্ধ করে দিয়ে মাল-সম্পদ জমা কারার প্রতি আত্ম নিয়োগ করেন না। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

وَلاَ تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكَ

তোমরা (মাল-সম্পদ) জমা করার প্রতি বেশী মনোযোগী হবে না, তাহলে আল্লাহও তোমার বিপক্ষের জমা ভাল করে সংরক্ষণ করবেন। (বুখারী মুসলিম) যিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, নিজের পরিবারের জন্য, মানবতার সেবার কাজে সাধ্যমত খরচ এবং ব্যয় করেন। হাদীসে তাকেই সাখী, দাতা বা দানকারী বলা হয়েছে। যিনি বা যারা এ ধরনের দানের অধিকারী তাদের বিশেষ মর্যাদা এবং কয়েকটি প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে অত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

প্রথম প্রতিদান ঃ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ **সে আল্লাহ্র নিকটতম হয়।** তার মানে হলো আল্লাহ্ যেহেতু শ্রেষ্ঠ দাতা সেই জন্য তিনি দাতাদেরকে বেশী ভাল-বাসেন। তাদের এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ্ হচ্ছেন উদার, তাঁর অফুরান্ত নিয়ামতের ভান্ডার থেকে তিনি প্রতিনিয়ত তাঁর সৃষ্টি জীবের জন্য দান করে যাচ্ছেন। আর তাঁর এই দানের মাধ্যমে মানুষ সহ সকল সৃষ্টি জীব জীবন ধারণ করছে এবং বেঁচে থাকছে। সুতরাং যার মধ্যে এই গুণ থাকবে স্বাভাবিক ভাবেই সে আল্লাহ্র নিকটবর্তী ব্যক্তি হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করে প্রিয় পাত্র হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রতিদান ঃ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ **সে জান্নাতের কাছাকাছি থাকে।** অর্থাৎ মুক্ত হস্তে দানের কারণে সে জান্নাতের অধিবাসী হয়ে যায়। দাতার জন্য এটা একটা বিরাট প্রতিদান। এর চেয়ে বড় আর কোন প্রতিদান হতে পারে না। তার কারণ মানুষের চূড়ান্ত টার্গেটই তো হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য এবং মানব সেবার জন্য নিজের ধন-সম্পদ একমাত্র আল্লাহরই রাজি-খুশির উদ্দেশ্যে মুক্ত হস্তে দান করে তার প্রতিদান হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং জান্নাত। আর এটাই হলো মানুষের চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সফলতা। তার কারণ হলো, দান করার মতো মহান কাজটি হলো আল্লাহ্ এবং জান্নাতের কাছাকাছি অবস্থানকারী লোকদের কাজ। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের কাজ। জান্নাতি লোকদের কাজ।

তৃতীয় প্রতিদান ঃ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ **সে মানুষের নিকতম থাকে।** দাতা বা দানকারীর তৃতীয় যে মর্যাদা বা প্রতিদান তা হলো সে মানুষেরও কাছাকাছি থাকে। তার মানে হলো, দাতা যখন দান করে সেই দান পরিবারের হোক,

অথবা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজেই হোক, কিম্বা মানব সেবার কাজেই হোক, সকল ক্ষেত্রে মানুষই উপকৃত হয়ে থাকে। কেননা মানুষের কল্যাণের জন্যই পরিবারের খরচ হয়। মানুষের কল্যাণের জন্যই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মানুষের কল্যাণের জন্যই মানব সেবার কাজে দান করা হয়। সকল ক্ষেত্রে মানুষই কল্যাণ প্রাপ্ত এবং উপকৃত হয়। আর এই উপকৃত হবার কারণেই মানুষ দাতাকে ভালবাসে, তাকে শ্রোদ্ধা করে এবং তার প্রতি সন্তুষ্টি হয়ে তার জন্য কল্যাণের দোআ করে। মোট কথা দাতা মানুষের খুব কাছের এবং অন্তরের লোক হয়ে যায়। সে সকলের ভালবাসার পাত্র হয়ে যায়। তারা দাতার কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ কামনা করে নয়। শুধু যে মানুষেরই ভালবাসার পাত্র হয়ে হয়ে যায় তা না। বরং ফেরেশতারাও তার জন্য কল্যাণের দোআ করে। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ- فَيَقُوْلُ اَحَدُ هُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُوْلُ الاٰخَرُ اِعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا-

যখনই বান্দারা ভোর বেলায় বিছানা থেকে ওঠে, তখনই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। তার মধ্যে একজন দোআ করতে থাকে হে আল্লাহ্! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও। আর অন্যজন দোআ করতে থাকে, হে আল্লাহ্! তুমি কৃপণকে লোকসান দাও। (বুখারী মুসলিম)

চতুর্থ প্রতিদান ঃ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ **জাহান্নাম থেকে দূরে থাকে।** অর্থাৎ দাতার দানের কারণে সে দোযখে তো যায় না বরং দোযখের ধারে কাছেও যায় না। যেহেতু দান করা নেকী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কাজ। সে হেতু তার এই অবদান তথা এই কাজের নেকী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সে জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। জাহান্নামের ধারে কাছেও ঘেঁষে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং নেকী মানুষকে জান্নাতেই নিয়ে যায়, জাহান্নামে নয়।

পক্ষান্তরে যারা বখিল তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্র হাদীসে বলেন ঃ

وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ-

আর বখিল বা কৃপণ ব্যক্তি থাকে-আল্লাহ্ হতে দূরে, জান্নাত হতে দূরে, মানুষ হতে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটে। হাদীসের এই অংশে পূর্বের অংশের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যারা বখিল বা কৃপণ, তারা তাদের কৃপণতার কারণে আল্লাহ্ হতে দূরে সরে যায়। জান্নাত হতে দূরে থাকে। মানুষের কাছ থেকেও দূরে সরে যায় এবং জাহান্নামের কাছাকাছি থাকে অর্থাৎ জাহান্নামে চলে যায়। অত্র হাদীসে কৃপণদের কয়েকটি ক্ষতির কথা উল্লেখ করে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

প্রথম ক্ষতি ঃ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ **তারা আল্লাহ্ থেকে দূরে থাকে।** অর্থাৎ যারা অর্থ-সম্পদ থাকার পরেও আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য খরচ করে না। নিজের পরিবারের নূন্যতম চাহিদা পূরণের জন্য ব্যয় করে না। যারা মানবতার কল্যাণে দান করে না, তারা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির পাত্রে পরিণত হয়। কেননা আল্লাহ্ দাতা-কৃপণ নন। তিনি কৃপণতাকে পছন্দ করেন না। কৃপণতা হলো তাঁর বৈশিষ্ট্যের বিপরীত। ফলে তিনি কৃপণদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। আর এই জন্যই কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

মহান আল্লাহ্ কৃপণদের সম্পর্কে বলেন ঃ

هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهٖ ط وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ-

শোন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে, অতঃপর কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরাই হলে অভাবী। (মুহাম্মদ-৩৮)। অর্থাৎ কেউ যদি কৃপণতা করে তাহলে তার নিজের জন্যই কৃপণতা করে। অর্থাৎ নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কেননা

আল্লাহ্র কোন অভাব নেই, বরং মানুষেরাই অভাবী।

দ্বিতীয় ক্ষতি ঃ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ **তারা জান্নাত থেকে দূরে থাকে।** অর্থাৎ তাদের বোখালতী বা কৃপণতার কারণে তারা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির পাত্র হয়ে গোনাহ্গার হয়ে যায়। আর আল্লাহ্র এই অসন্তুষ্টি ও গোনাহ্র কারণে তারা জান্নাতের ধারে কাছে যেতে পারে না। তারা জান্নাত থেকে অনেক দূরে থাকে।

তৃতীয় ক্ষতি ঃ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ **তারা মানুষ থেকেও দূরে থাকে।** অর্থাৎ কৃপণদের কৃপণতার কারণে তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং অভাবগ্রস্থ মানুষ তাদের প্রাপ্ত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবার কারণে তার প্রতি অন্তুষ্ট হয়ে তার পাশ থেকে দূরে সরে যায়। তার জন্য কল্যাণের দোআ করে না। তার দিকে সুদৃষ্টি দেয় না। তার বিপদ-আপদেও কাছে আসে না। কৃপণদের কৃপণতার কারণে শুধু মানুষই অসন্তুষ্ট হয়–তা নয়। বরং ফেরেশতারা পর্যন্ত বদদোআ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ– وَيَقُوْلُ الْاٰخِرُ اِعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

এবং অন্য ফেরেশতা বলতে থাকে, হে আল্লাহ্ তুমি কৃপণ ব্যক্তিকে লোকসান দাও। (বুখারী মুসলিম)

চতুর্থ ক্ষতি ঃ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ **জাহান্নামের নিকটে থাকে।** কৃপণ ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বড় এবং মারাত্মক যে ক্ষতি তা হলো, তার এই কৃপণতার কারণে সে জাহান্নামের ধারে পৌঁছে যায় অর্থাৎ জাহান্নামে চলে যায়। কৃপণতা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যে, কৃপণতার ফল হিসেবে সে আল্লাহ্র অপ্রীয় হয়ে যায়। মানুষের অপ্রীয় হয়ে যায়। এমনকি ফেরেশতাদেরও অপ্রিয় হয়ে যায়। যার ফলে তারা তার জন্য বদদোআ পর্যন্ত করে বসে। মানুষের পারলৌকিক মুক্তি বা সফলতাই হলো আসল মুক্তি বা সফলতা। সুতরাং যারা বখিল তারা দুনিয়ার জীবনে যেমন সম্মান এবং শ্রদ্ধা পায় না, তেমনি তারা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি এবং ফেরেশতাদেরও লানতের পাত্র হয়ে যায়। পরিণতিতে তাকে জাহান্নামে যেতে হয়। আল্লাহ্ আমাদেরকে কৃপণতা থেকে হেফাজত করুন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসের সর্বশেষ অংশে বর্ণান করেন ঃ

وَالْجَاهِلُ سَخِيٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ–

আর একজন জাহেল দাতা একজন কৃপণ আবেদের তুলনায় আল্লাহ্‌র কাছে বেশী প্রিয়।

হাদীসের সর্বশেষ এই অংশে দাতা এবং কৃপণ ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে তুলনামূলক গ্রহণযোগ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একজন দাতা, কিন্তু সে জাহেল-মুর্খ, এবাদত-বন্দেগী তেমন বোঝে না এবং করেওনা। কিন্তু সে সাখী, দাতা, এবং দানের ব্যাপারে সে মুক্ত হস্ত। আল্লাহ্‌র জন্য, তার নিজের পরিবার এবং মানবতার সেবার জন্যে সে খোলা হাতে দান করে। এসব ক্ষেত্রে খরচের ব্যাপারে কোন কিছু তাকে ঠেকাতে পারে না। এমন দাতাই আল্লাহ্‌র কাছে বেশী প্রিয় এবং ভালবাসার পাত্র একজন কৃপণ ব্যক্তির তুলনায়। অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি জ্ঞানী, এবাদত–বন্দেগীতে তৎপর হওয়ার পরও সে আল্লাহ্‌র জন্যে, নিজের পরিবার এবং মানবতার সেবার জন্যে কোন খরচ বা দান করে না। দানের ক্ষেত্রে সে মুষ্টিবদ্ধ। ফলে সে আল্লাহ্‌র কাছে অপ্রিয় অপছন্দনীয় হয়ে যায়। তার কারণ হলো আল্লাহ্ নিজে দাতা কৃপণ নন। তিনি কৃপণতাকে পছন্দ করেন না। কৃপণতা আল্লাহ্ তাআলার বৈশিষ্টের পরিপন্থী। যেহেতু তিনি সাখী, দাতা। তাই তিনি সাখী, দাতা বা দানকারীকে বেশী পছন্দ করেন। কেননা দানের মধ্যে আল্লাহ্‌র অনেক ইবাদত বন্দেগী নিহিত রয়েছে। দান করাই হলো একটা বড় ইবাদত। কৃপণতা হলো শয়তানী কাজ। কেননা শয়তান কৃপণতার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়। মহান আল্লাহ্ আল কুরআনে সূরা বাকারার ২৬৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেন–

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার অর্থাৎ কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আয়াতে এখানে কৃপণতাকে অশ্লীলতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর অশ্লীল কাজ তো মানুষের দুষমন শয়তানেরই কাজ। সুতরাং যত বড়ই আবেদ হোক না কেন, শয়তানের এই অশ্লীল কাজ কৃপণতার কারণে সে আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে যায়। আল্লাহ্ তার এই কাজকে মোটেই পছন্দ করেন না। কিন্তু তিনি একজন জাহেল দাতাকে পছন্দ করেন। কেননা দান করার মধ্যে আল্লাহ্‌র হক এবং বান্দাহর হক উভয় আদায় হয়ে যায়।

অপরপক্ষে কৃপণতার কারণে আল্লাহ্ এবং বান্দা উভয়রই হক বা অধিকার নষ্ট হয়ে যায়। আর এই জন্যেই আল্লাহ্র কাছে একজন জাহেল দাতা একজন কৃপণ আবাদের তুলনায় অনেক উত্তম এবং প্রিয়।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো। এতে যেসব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা আপনাদের সামেন তুলে ধরছি।

০ ধনী অথবা গরীব হোক, সকল অবস্থায় দান করতে হবে।

০ স্বচ্ছল অবস্থায় হোক, আর অস্বচ্ছল অবস্থায় হোক, নিজের রুযি থেকেই আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং অভাবী পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ করতে হবে।

০ দান বেহিসাব করতে হবে। কত দান করলাম তা বার বার হেসাব কষা যাবে না। কেননা দানের হেসাব কষতে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন।

০ দান-আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, নেকী অর্জন এবং জান্নাত পাবার আশায় করতে হবে।

০ আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি, গোনাহ্ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য দান করতে হবে।

০ কৃপণতাকে ঘৃণা করতে হবে কৃপণতা থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা কৃপণতা হলো শয়তানী কাজ। আর এই শয়তানী কাজ মানুষকে আল্লাহ্, জান্নাত এবং মানুষ থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

০ আল্লাহ্র অন্যান্য বন্দেগী করবো অথচ দান করবো না কৃপণতা করবো এটা করা যাবে না। এই আচরণ আল্লাহ্র কাছে খুবই অপছন্দনীয়।

০ সর্বপরি সকল অবস্থায় এবং সকল প্রকারের দান বা খরচ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে খরচ করা যাবে না।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এতে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা যেন বাস্তব জীবনে কার্যকরী করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি।

পাঁচ

দুনিয়া ভোগীদের প্রতিফল এবং দুনিয়া ত্যাগীদের প্রতিদান

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكِسَ وَاِذَا شِيْكَ فَلَا انْتُقِشَ طُوْبٰى بِعَبْدٍ اٰخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ اِنْ كَانَ فِىْ الْحِرَاسَةِ كَانَ فِى الْحِرَسَةِ وَاِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ اِنْ اِسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهٗ وَاِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ (بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে দীনারের (স্বর্ণ মুদ্রা) দাস, দিরহামের (রৌপ্য মুদ্রা) দাস এবং কম্বলের দাস। তার হীনমন্যতার অবস্থা এই যে, যদি তাকে কোন কিছু দান করা হয় তাহলে সে আনন্দিত হয়, আর যদি তাকে কিছু না দেয়া হয় তবে সে বিগড়ে যায়। আল্লাহ্ যেন এমন কাপুরুষকে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করে। যদি তার দেহে কাঁটা বিধে তবে যেন তা বের না হয়। আর ঐ ব্যক্তি ভাগ্যবান, যে আল্লাহ্র পথে নিজ ঘোড়ার লাগাম লাগিয়ে সদা (জীহাদের জন্য) প্রস্তুত থাকে। তার মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো এবং তার পা দু'টো ধুলি মলিন থাকে। (তার নম্রতা ও সরলতার অবস্থা এই যে) যদি তাকে সেনাবাহিনীর অগ্রভাগের রক্ষক (সেনাপতি) হিসেবে নিয়োগ করা হয়,

তবে সে সূচারুরূপে তা পালন করে। আর যদি তাকে সেনাবাহিনীর পেছনে ফেলে রাখা হয়, তবুও সে সানন্দে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে। মোট কথা, সে হবে অত্যন্ত বাধ্য। শুধু দীনেরই খেদমত হবে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। (বুখারী)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ -হতে বা থেকে। قَالَ -বলেন। تَعِسَ–ধ্বংস হোক। عَبْدٌ –দাস বা গোলাম। دِيْنَارٍ–আরবীয় স্বর্ণ মুদ্রা। وَ–এবং। دِرْهَم –আরবীয় রৌপ্য মুদ্রা। الْخَمِيْصَةِ–মোটা জাতীয় কাপড় (কম্বল)। اِنْ–যদি। اُعْطِىَ –তাকে দেয়া হয়। رَضِىَ –খুশি বা আন্দতি হয়। لَمْ يُعْطَ- দেয়া না হয়। سَخِطَ-বিগড়ে যায় বা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। تَعِسَ –ধ্বংস। وَانْتَكِسَ –এবং লাঞ্ছিত করে। اِذَاشِيْكَ–যখন কাঁটা বিধে। فَلاَ انْتَقِشَ- –অতঃপর যেন তা বের না হয়। طُوْبٰى–ভাগ্যবান। اٰخِذٍ–ধরে প্রস্তুত থাকে। بِعَنَانِ فَرَسِهٖ -তার ঘোড়ার লাগাম লাগিয়ে। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- –আল্লাহ্‌র পথে। اَشْعَثَ উস্‌কো-খুস্‌কো। رَاْسُهٗ –তার মাথার চুল। مُغْبَرَّةٌ -ধুলো মলিন। فَقَدَ مَاهٗ –তার পাদ্বয় اِنْ –যদি। كَانَ - করা হয়। فِىْ –মধ্যে। اَلْحِرَسَةِ –সেনাবাহিনীর অগ্রগামী (সেনাপতি)। - اَلسَّاقَةِ –সেনাবাহিনীর পেছনে। (সাধারণ সৈনিক)। اِنْ –যদি। اِسْتَأْذَنَ –অনুমতি বা আদেশ।لَمْ يُؤْذَنَ لَهٗ–তার অনুমতি বা আদেশ অমান্য করে না। سَفَعَ -বাধ্য বা অনুগত।

সম্বোধন ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য বিশিষ্ট সাহাবী এবং সর্বাধিক্য হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসটি পাঠ এবং অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে হাদীসটির ব্যাখা এবং শিক্ষা সঠিক ভাবে তুলে ধরার তাওফীক দান করেন। আমীন।

হাদীসটি বর্ণনার সময়কাল ঃ আল কুরআনের আয়াত নাযিলের সময়কাল যেভাবে নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা যায়, হাদীসের ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব না হলেও হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয়, হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাদানী জীবনে বর্ণনা করেছিলেন। কেননা হাদীসের মধ্যে জিহাদের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া বৈষয়িক চাহিদার কথাও বলা হয়েছে যা মাদানী জীবনের জন্যই প্রযোজ্য, মাক্কী জীবনের জন্য নয়। তাছাড়া আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।

রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ রাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় **তিন নম্বর** হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখার অনুরোধ রইলো।

হাদীসটি গ্রহণকারী কিতাবের পরিচয় ঃ সিহাহ-সিত্তা বা বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসের কিতাবের মধ্যে বুখারীর স্থান হলো সর্বোচ্চে। মুহাদ্দেসীনে কেরাম বলেন ঃ আসমানের নীচে এবং যমীনের উপরে পবিত্র কুরআনের পরে আর যদি কোন বিশুদ্ধ কিতাব থাকে তবে সেটা হলো সহীহ্ আল বুখারী। হাদীসের কেতাবের মধ্যে এটা হলো সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য হাদীসের কেতাব।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে হাদীসটির প্রাথমিক কিছু তথ্য প্রদান করলাম। এখন আমি মূল হাদীসের ব্যাখ্যা পেশ করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুনিয়াদার স্বার্থবাজদের সম্পর্কে বলেন ঃ

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ
اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ-

ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে দ্বীনারের দাস, দেরহামের দাস, কম্বলের দাস। যদি তাকে কোন কিছু দেয়া হয় বা দান করা হয়, তবে সে খুশি হয়ে যায়। আর যদি তাকে কোন কিছু দেয়া না হয়, তাহলে সে ব্যাজার হয়ে যায় বা বিগড়ে যায়।

হাদীসের এই অংশে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেইসব দুনিয়া লোভী স্বার্থবাজদের জন্য বদদোআ করেছেন, যারা দুনিয়ার স্বার্থ পূরণ হলে মহা খুশী হয়ে যায়। আর স্বার্থ পূরণ না হলে অথবা স্বার্থের ক্ষতি হলে ব্যাজার হয়ে যায়, মন খারাপ করে

বিগড়ে যায় এবং আবোল-তাবোল মন্তব্য করতে শুরু করে দেয়।

তারা টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদের জন্য এতো নীচে নেমে যায় যে, তারা তা পেলেই খুশী হয়ে যায়। টাকা-পয়সা-অর্থ-সম্পদের লোভ তাদেরকে এমন ভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যে, তারা এছাড়া আর কিছুই বোঝে না। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে টাকা-পয়সা অর্থ-সম্পদের দাস বা গোলাম বলে মন্তব্য করেছেন। দাস বা চাকর যেমন মনিবের অনুগত হয়ে থাকে। তেমনি এসব স্বার্থবাজ, দুনিয়ালোভীরা যেন টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদের অনুগত দাসে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এরা টাকা অথবা সম্পদ পেলেই খুশী না পেলেই ব্যাজার। আসলে এরা প্রকৃত ইমানদার নয়। রাসূলের আদর্শের অনুসারী এবং আল্লাহ্ প্রেমীক নয়। এরা দুনিয়া ত্যাগী আখেরাত মুখী নয়। এ জন্যেই রাসূল (সাঃ) এসব স্বার্থবাজদের জন্য বদদোআ করেছেন। এসব কাপুরুষদেরকে ধ্বংস এবং অপমান-অপদস্ত করার জন্য আল্লাহ্র কাছে কামনা করে বলেছেন ঃ

تَعِسَ وَانْتُكِسَ وَاِذَا شِيْكَ فَلَا انْتُقِشَ-

আল্লাহ্ যেন এমন কাপুরুষকে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করেন। আর যদি তার দেহে কাঁটা বিধে তবে যেন তা বের না হয়।

যারা অর্থ-সম্পদের দাস, যারা এসব পেলেই খুশী হয়ে যায়, আর না পেলেই বিগড়ে গিয়ে আবোল-তাবোল মন্তব্য করা শুরু করে। এরা হলো- হীনমন্য, কাপুরুষ, স্বার্থবাজ। এদের জন্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বদদোআ দিয়ে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যেন এদেরকে উভয় জগতে ধ্বংস এবং লাঞ্চিত করেন, অপমান-অপদস্ত করেন। আর দেহে যদি কাঁটা বিধে তবে যেন তা বের না হয়। যদি দেহের কোথাও আঘাত লাগে তাহলে সেই আঘাতের ব্যথা যেন দূর না হয়। দেহে যদি কোন ক্ষত হয় তাহলে যেন সেই ক্ষত না শুকায়।

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) সাধারণতঃ এমন ভাবে বদদোআ করেন না। কিন্তু তিনি এতো কঠিন বদদোআ করলেন কেন ? আসলে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) কোন ব্যক্তিকে সরাসরি এভাবে বদদোআ করেননি। এখানে বদদোআ করেছেন একটা শ্রেণীকে। একটা বদ অভ্যাসের দাসের অধিকারীদের। আসলে অপরাধটি অত্যান্ত গুরুতর। কেননা, এসব স্বার্থবাজদের কাছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কোন মূল্য নেই। আখেরাতের কোন গুরুত্ব নেই। জান্নাতের কোন আশা নেই।

জাহান্নামের কোন ভয় নেই। এদের কাছে অর্থ-সম্পদই সব কিছু। এসব কিছুই তাদের আশা-ভরসা। এসব পেলেই তারা মহা খুশী। এ সবেই তারা সন্তুষ্ট। তারা অর্থ এবং সম্পদের বিনিময়ে ঈমান-আমান সহ সব কিছুই বিক্রয় করে দিতে প্রস্তুত। এটা মুমিনদের গুণ নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পরিপূর্ণ মুমি-নদের গুনাবলীর কথা উল্লেখ করে অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ-

যে ব্যক্তির ভালবাসা ও মন্দবাসা, দান করা ও না করা, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই হয়ে থাকে, সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার। (বুখারী)

অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) সৌভাগ্যবানদের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

طُوْبٰى لِعَبْدٍ اٰخِذٍ بِعَنَانِ فَرَسِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَشْعَثَ رَأْسُهٗ مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ-

আর ঐ ব্যক্তি ভাগ্যবান, যে আল্লাহ্‌র পথে নিজ ঘোড়ার লাগাম লাগিয়ে সদা (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত থাকে। (জিহাদের কাজে রতো থাকার জন্য) মাথার চুল উসকো-খুসকো থাকে এবং তার পা দু'টো ধুলি মলিন থাকে।

এখানে স্বার্থবাজ, অর্থলোভী, দুনিয়াদারদের বিপরীতধর্মী আল্লাহ্‌ প্রেমীক দুনিয়া ত্যাগী সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে ঐ ব্যক্তিরাই সৌভাগ্যবান অর্থাৎ সফলকামী, যারা আল্লাহ্‌র দীন আল্লাহ্‌র যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদে রতো আছে এবং খোদাদ্রোহী শক্তির আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য ঘোড়া তথা যুগোপযোগী যুদ্ধযান নিয়ে সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকে। যাদের খোদাদ্রোহী শক্তির সাথে যুদ্ধ সংগ্রামে লিপ্ত থাকার কারণে চুলগুলো উস্‌কো-খুস্‌কো হয়ে যায়। যুদ্ধ জিহাদে ব্যস্ত থাকার কারণে অবসর গ্রহণ এবং ক্লান্তি দূর করার কোন সুযোগই পাই না। অবিরাম গতিতে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যায়। আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে বা জিহাদে রতো থাকার ফলে তার পা দু'টো ধুলোই ধুসোরিত হয়ে মলিন হয়ে যায়। পরিস্কার করার সুযোগই করতে পারে না। অর্থাৎ সার্বক্ষণিক জীবন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে

রতো থাকে। অবসর নেয় না। ফাঁকি দেয় না। জিহাদ থেকে মোটেই ফুর্সোত পায় না। এসব গুণের অধিকারী দুনিয়া ত্যাগী মুজাহীদরাই হলো সৌভাগ্যবান। রাসূলের আশির্বাদপুষ্ট ঈমানদার মুসলমান। যাদের আরাম-আয়েশ, ত্যাগ, দুনিয়া বিমুখোতা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং রাসূলের মহব্বতের জন্য, জান্নাতের আশায়-জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) সৌভাগ্যবান বান্দাদের আরো একটা মহত গুণের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

اِنْ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ كَانَ فِى الْحِرَسَةِ وَاِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ اِنْ اِسْتَأْذِنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهٗ وَاِنْ شَفَعَ لَمْ يُسَفَّعْ -

(মুজাহীদদের নম্রতা ও আনুগত্যের অবস্থা এই যে) যদি তাকে সেনাবাহিনীর অগ্রভাগের রক্ষক হিসেবে অর্থাৎ সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়, তবে সে দক্ষতার সাথে সুষ্ঠভাবে তা পালন করে। আর যদি তাকে সেনাবাহিনীর পেছনে ফেলে রাখা হয়, অর্থাৎ সাধারণ সৈনিকে রূপান্তরিত করা হয় তবুও সে সানন্দে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে যায়। মোট কথা সে হবে অত্যন্ত বাধ্য এবং আনুগত্য পরায়ণ। আর শুধু দ্বীনেরই খেদমত হবে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রতো ভাগ্যবান মুজাহীদেরা এতই নম্র-ভদ্র, অনুগতপ্রিয় ও বাধ্য যে, যদি তাদের মধ্য থেকে কাউকে সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সে তার দায়িত্ব নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সাহসিকতা ও দক্ষতার সাথে অত্যন্ত সুন্দর এবং সুষ্ঠভাবে পালন করে যায়। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অলসতা বা গাফলতি দেখায় না। দুষমনের ভয়ে ভীত হয়ে যায় না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না। বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে অত্যন্ত সাহসিকতা ও দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি তাকে সেনাবাহিনীর পেছনে অর্থাৎ একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, সেনাপতি থেকে সাধারণ একজন সৈনিকে পরিণত করা হয়, তাতেও তার কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।

বরং একজন বাধ্য-অনুগত সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সেনাপতির আদেশ মান্য করে আনন্দের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তার কাজে কোন ভাটা পড়ে না। যেমন হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ একবার এক যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। এমন সময় যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই গভর্ণরের আদেশনামা পৌঁছলো যে খালিদ-বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো। সাথে সাথে তিনি সেই আদেশ নামার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে নতুন সেনাপতির হাতে পতাকা তুলে দিয়ে একজন সাধারণ সৈনিক সেজে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। কি তার আনুগত্য! কি তার ত্যাগ! কি তার আল্লাহ্ প্রেম! হাদীসে এই শ্রেণীর সৌভাগ্যবান এবং সফলকাম, নম্র, ভদ্র, সরল এবং বাধ্য অনুগত মুজাহীদদের কথায় বলা হয়েছে। আল্লাহ্র দ্বীনের পথে জিহাদ করতে গিয়ে এমন আনুগত্য প্রদর্শন করে যে, তার মধ্যে কোন অবস্থায় শয়তানী ওয়াসওয়াসা পয়দা হয় না। তার মধ্যে কোন রিয়া বা অহংকার সৃষ্টি হয় না। এর পেছনে মূল কারণই ছিলো আল্লাহ্ ভীতি, আল্লাহ্ প্রেম এবং রাসূলের প্রতি মুহাব্বত।

অনুগত, বাধ্য সদা প্রস্তুত দ্বীনের মুজাহীদদের আরো একটা বিশেষ বৈশিষ্ট হলো তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একমাত্র দ্বীনের খেদমত করা, দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। আসলে এটা টার্গেট হবার কারণেই তারা দ্বীনের জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকে। দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকে। বৈসয়িক সুখ-শান্তি এবং রুপচর্চার কোন সুযোগই পাই না। কোন পদে বা দায়িত্বে নিয়োজিত আছে বা করলো তার দিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তার খেয়াল শুধু আমি দ্বীনের কাজে প্রকৃত হক আদায় করতে পারছি কি না ? আমার কাজে আল্লাহ্ খুশী হচ্ছে কি না ? তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য শুধু দ্বীনের খেদমত তথা দ্বীনি আন্দোলনে শরীক থেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। মহান আল্লাহ্ এদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন ঃ

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ-

নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কূরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ একমাত্র আল্লাহ্র (রাজি খুশির) জন্য। (আনয়াম-১৬২)

সুতরাং সৌভাগ্যবান সফল ব্যক্তিদের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি সময়, প্রতিটি চিন্তা এবং পরিকল্পনা, তার বেঁচে থাকা, মরে যাওয়া, ইবাদত-বন্দেগী, যুদ্ধ-জিহাদ, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব একমাত্র মহান রাব্বুল আ'লামীনেরই সন্তুষ্টির জন্যে, রাজি-খুশির জন্যে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো তা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা হলো ঃ

✪ ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদের গোলাম হওয়া যাবে না। অর্থ-সম্পদকেই সবকিছুর মূল বানানো যাবে না। কারণ এটা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়।

✪ ব্যক্তি, সংগঠন, সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কি পেলাম, আর কি পেলাম না, এটাকে রাজি-নারাজির টার্গেট বানানো যাবে না।

✪ আল্লাহ্‌র রাসূলের বদ দোআ থেকে আমাদেরকে সব সময় বেঁচে থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌র রাসূলের দোআ কোন দিন বিফল হয় না। সুতরাং তার বদ দোআ মানেই হলো তার দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগত ধ্বংস হয়ে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করা।

✪ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) অর্থ-সম্পদের লোভী গোলামদের হীনমন্য ও নীচ শ্রেণীর লোক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

✪ আল্লাহ্‌র দ্বীনের খেদমত বা প্রতিষ্ঠার কাজে সদা-সর্বদা নিয়োজিত থাকতে হবে। যেভাবে একজন মুজাহীদ লড়াই করার জন্য সদা-সর্বদা ঘোড়ার লাগাম লাগিয়েই প্রস্তুত থাকে।

✪ আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য সদা প্রস্তুত কিনা তা তার দেহের পোষাক-আষাক, মাথার চুল এবং পায়ের জুতা দেখেই টের পাওয়া যাবে।

✪ সকল সময়, সকল অবস্থায় নিজের সরলতা, নম্রতা এবং আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে।

✪ নেতৃত্ব কর্তৃত্বের মোহ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আর যদি নেতৃত্ব থাকা

অবস্থায় নেতৃত্ব চলে যায়, তবে তার জন্য কোন প্রতিক্রিয়া তো হবেই না। বরং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব আনন্দের সাথে পালন করে যাবে।

✪ আল্লাহ্‌র দীনের খেদমত বা দ্বীন প্রতিষ্ঠাকেই একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানাতে হবে। এর কোন সুযোগ-সুবিধাকে লক্ষ্য বানানো যাবে না।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ক্রটি হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এতে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা যেন বাস্তব জীবনে কার্যকরী করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে শেষ করছি।

যে সব আ'মল জান্নাতে নিয়ে যায় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرَنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِىَ الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُ نِىْ مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ لَقَدْ سَاَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ ؛ وَاِنَّهُ لَيَسِيْرُ عَلٰى مَنْ يَّسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: اَلَا اَدُلُّكَ عَلَى اَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِىُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِىُ الْمَاءُ النَّارَ؛ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلَا: (تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتّٰى بَلَغَ (يَعْمَلُوْنَ) (اَلسَّجْدَةُ-١٦) ثُمَّ قَالَ: اَلَا اَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ؛ وَعَمُوْدِهٖ، وَذَرْوَةِ سَنَامِهٖ - قُلْتُ : بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ؛ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ، وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ- ثُمَّ قَالَ: اَلَا اَخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ؟ قُلْتُ: بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؛ فَاَخَذَ بِلِسَانِهٖ

قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا؛ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهٖ؟ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ؟ (رَوَاهُ التِّرْمِذِى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

অনুবাদ ঃ হযরত মুয়া'জ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি একদা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ), আমাকে এমন আ'মল বা কাজের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন ঃ আসলে তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছো। অবশ্য আল্লাহ্‌ তাআ'লা যার জন্য সহজ করে দেন তার জন্য একাজ করা খুবই সহজ। আর তা হলো তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে। অতপরঃ তিনি আবারও বললেন ঃ আমি কি তোমাকে খায়ের বা কল্যাণের দরওয়াজাগুলো বলে দেব না ? (সেগুলো হলো) রোযা ঢাল স্বরূপ (প্রতিরোধকারী)। সাদকাহ্‌ (যাকাত) গোনাহ্‌ সমূহকে এমন ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয় যেমন ভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। আর মানুষের গভীর রাতের নামাজও (তাহাজ্জুদ) এভাবে গোনাহসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। অতঃপর তিনি নীচের আয়াত পাঠ করলেন ঃ "তাতাজাফা জুনুবুহুম আনিল মাযাজি–ইয়া'লামুন" পর্যন্ত। (সাজদাহ্‌-১৬,১৭) অর্থাৎ "তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে। তারা নিজেদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আশার সাথে। আর আমি তাদের জন্য যা কিছু রুজি বা জিবিকা দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। ফলে তাদের প্রতিদান হিসেবে তাদের জন্য চোখ জুড়ানো সে সব জিনিস দেয়া হবে যা গোপন রাখা হয়েছে, যা কোন প্রাণীই জানে না।" (সূরা আস্‌ সাজদা-১৬-১৭)। রাসূল (সাঃ) পুনরায় বললেন ঃ তোমাকে কি (দ্বীনের) যাবতীয় কাজের মূল, তার কান্ড এবং সর্বোচ্চ চূড়ার কথা বলবো না ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) তা তো অবশ্যই বলবেন।

তিনি বললেন ঃ (দ্বীনের) যাবতীয় কাজের মূল উৎস হলো ইসলাম, তার কান্ড হলো নামাজ এবং সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ। তিনি আবার বললেন ঃ আমি কি তোমাকে ঐসব গুলোর মূল বা আসলটা বলে দেব না ? আমি বললাম, হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহ্‌র রাসূল ঃ তিনি তাঁর জিহ্বা টেনে ধরে বললেন ঃ এটা তোমার কন্ট্রোলে (নিয়ন্ত্রণে) রাখবে। আমি প্রশ্ন করলামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ), আমরা স্বাভাবিক কথা-বার্তায় যা বলে থাকি তার জন্যেও কি পাকড়াও হবো ? তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতি তোমার মা গম্ভীর হোক! মানুষকে তো তার জিহ্বা দ্বারা উপার্জিত জিনিসের কারণেই জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। (ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি চমৎকার ও বিশুদ্ধ)।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ -থেকে বা হতে। قَالَ -বলেন বা বলেছেন قُلْتُ- -আমি বললাম। يَا -হে বা ওহে। اَخْبِرْنِىْ -আমাকে খবর দিন বা জানিয়ে দিন। بِعَمَلٍ -আ'মল বা কাজের। يُدْخِلُنِىْ -আমাকে প্রবেশ করাবে। يُبَاعِدُنِىْ-আমাকে দূরে রাখবে। مِنَ النَّارِ-আগুন বা জাহান্নাম থেকে। لَقَدْ-অবশ্যই। سَاَلْتَ -প্রশ্ন করেছো। عَظِيْمٌ-বড় বা গুরুত্বপূর্ণ। اِنَّهُ -নিশ্চয় উহা বা তা। لَيَسِيْرٌ -অবশ্যই সহজ। مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ।-আল্লাহ্ যার জন্য সহজ করে দেন। تَعْبُدُ اللّٰهَ-তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে। لَا تُشْرِكُ -শিরক করবে না। بِهٖ-তাঁর সাথে। شَيْئًا-কোন কিছুকে। تُقِيْمُ الصَّلٰوةَ -নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করবে। وتؤتى الزكاة -এবং যাকাত আদায় করবে। تَصُوْمُ رَمَضَانَ-রমযান মাসে রোজা রাখবে। وَتَحُجُّ الْبَيْتَ-এবং বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে। ثُمَّ-অতঃপর। اَلَا اَدُلُّكَ-আমি কি তোমাকে বলে দেব না ? اَبْوَابُ الْخَيْرِ-কল্যাণের দরওয়াজা সমূহ। اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ- রোজা ঢালস্বরূপ। اَلصَّدَقَةُ-সাদকাহ্ বা যাকাত। تُطْفِىْ -নিশ্চিহ্ন বা খতম

করে। اَلْخَطِيْئَةَ-গোনাহ্ সমূহ। كَمَا-যেমন করে। اَلْمَاءُ-পানি। اَلنَّارُ -আগুন (দোযখ) اَلرَّجُلُ-পুরুষ এখানে মানুষ। جَوْفِ اللَّيْلِ-গভীর রাত। اُخْبِرُكَ-আমি তোমাকে খবর দেব বা অবগত করবো। بِرَأْسِ الْاَمْرِ -কাজের আসল বা মূল। عَمُوْدِهٖ-তার বা উহার কান্ড। ذُرْوَةِ سَنَامِهٖ-উহার সর্বোচ্চ চূড়া। قُلْتُ আমি বললাম। بَلٰى-হ্যাঁ। -بِمَلَاكِ-প্রধান, মূল বা আসল। ذٰلِكَ-ঐ বা ওটা ।كُلِّهٖ-উহার প্রত্যেকটি। فَاخَذَ-অতঃপর ধরলেন। بلسانه -তাঁর জিহ্বা। اِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ-নিশ্চয় আমরা পাকড়াও হবো। بِمَا-তার জন্য। نَتَكَلَّمُ-আমরা যেসব কথা বলি। ثَكِلَتْكَ -তোমার জন্য গম্ভীর হোক। اُمُّكَ-তোমার মা। هَلْ-কি। -يَكُبُّ النَّاسَ -মানুষকে নিক্ষেপ করা হবে। فِى النَّارِ-জাহান্নামে। عَلٰى وُجُوْهِهِمْ-তাদের মুখের ভরে। اِلَّا ছাড়া বা ব্যতীত। حَصَائِدُ-উপার্জিত জিনিস। اَلْسِنَتِهِمْ-তার জিহ্বা বাা কথার দ্বারা।

সম্বোধন ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আমি আপনাদের সামনে বিশিষ্ট সাহাবী এবং রাবী হযরত মুয়া'জ বিন যাবাল (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি পাঠ এবং অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তাওফিক দান করেন।

রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ নাম-মুয়া'জ। **ডাক নাম**-আবু আবদির রহমান। **লকব বা উপাধি**-ইমামুল ফোকাহা, কানযুল উলামা ও রাব্বানিয়্যুল কুলূব। মদীনার খায্রাজ গোত্রের উদায় ইবনু সা'দ শাখার সন্তান। **পিতার নাম**-জাবাল ইবনে আমর। **মাতার নাম**-হিন্দা বিনতু সাহল আল জুহাইনিয়্যা।

ইসলাম গ্রহণ–রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হিজরাতের পূর্বে নবুয়াতের দ্বাদশ বছর ১৮

বছর বয়সে ইয়াসরীবে রাসূলের পাঠানো দাঈ (আহবানকারী) মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হজ্জ মওসুমে মক্কায় হজ্জ করতে যান এবং 'আকাবায়' রাসূলের হাতে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করেন। এটা ছিল দ্বিতীয় বা সর্বশেষ আকাবার বাইয়াত। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৭২/৭৫ জন। হযরত মুয়া'জের ইসলাম গ্রহণ করার অল্প কিছুদিন পরেই মহানবী (সাঃ) মক্কা থেকে ইয়াসরীবে (মদীনায়) হিজরাত করেন।

হযরত মুয়া'জ একজন কুরআনের হাফেজ ছিলেন এবং যে ছয় জন অহী লেখক ছিলেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম সদস্য ছিলেন। তাবুকে সফল অভিযানের পর ইয়ামান বাসীরা ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত মুয়া'জকে সেখানকার প্রথম আমীর নিযুক্ত করেন।

হযরত মুয়া'জ এর মৃত্যুর পূর্বে ডান হাতের শাহাদাৎ আংগুলে একটা ফোড়া হয় এবং সেই ফোড়ার প্রচন্ড ব্যাথায় তিনি মাঝে মাঝে বেঁহুস হয়ে যেতেন। হযরত মুআ'জ আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে বেশ মতপার্থক্য আছে। তবে সর্বাধিক প্রশিদ্ধ মতে হিজরী ১৮ অথবা ১৯ সনে ৩৮ বছর বয়সে বাইতুল মাক্‌দাস ও দিমাশকের মধ্যবর্তী এবং জর্দান নদীর তীরবর্তী 'বীসান' নামক স্থানে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরই কাছাকাছি একটি স্থান যেখান থেকে আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেন, সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। রাসূলের জীবনকালে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দায়িত্বে ব্যাস্ত থাকার কারণে তিনি খুব বেশী হাদীস বর্ণনা করতে পারেননি। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে হযরত মুয়া'জের নামটি তৃতীয় তবকায় গণনা করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১৫৭টি। (আসহাবে রাসূলের জীবন কথা)

হাদীসটি বর্ণনার সময়কাল ঃ হাদীসটির বর্ণনাকারী এবং বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসটি মাদানী জীবনে বর্ণনা করেছেন। কেননা বর্ণনাকারী মুয়া'জ (রাঃ) একজন আনসারী এবং মদীনাবাসী ছিলেন। আর বিষয়বস্তুতে দেখা যায় ইসলামের মৌলিক ইবাদত সমূহ এবং জিহাদের কথা উল্লেখ রয়েছে যা মাদানী জীবনে সংঘটিত হয়েছিলো মাক্কী জীবনে নয়।

হাদীসটি বর্ণিত কিতাবের পরিচয় ঃ হাদীসটি 'সিহাহ সিত্তাহ্' বা 'বিশুদ্ধ ছয়টি' হাদীস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ইমাম তিরমিযীর সংকলিত তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের এই গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীস সহীহ, বিশুদ্ধ। আর দারসের জন্য বর্ণিত হাদীসটিকেও ইমাম তিরমিযী হাসান (উত্তম) এবং সহীহ্ বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির অনুবাদসহ প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য প্রদান করা হলো। এখন আমি হাদীসটির ব্যাখ্যা নিম্নে উল্লেখ করছি। হাদীসের প্রথমেই রাবী মুয়া'জ (রাঃ) নিজেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকা কোন আ'মল বা কাজের ভিত্তিতে সম্ভব সেই প্রশ্ন করে বলেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِىْ الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُ نِىْ مِنَ النَّارِ-

হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) আমাকে জানান, কোন আ'মল বা কাজের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকা যায় ? প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সরাসরি উত্তর না দিয়ে তার এই ধরনের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে উৎসাহ প্রদান এবং প্রশ্নের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ **আসলে তুমি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছো।** অতঃপর তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে যে সব আ'মলের কথা বলবেন তার কাঠিন্যকে হালকা করার জন্য রাসূল বল্লেন ঃ وَاِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ-**অবশ্য আল্লাহ্ তাআলা যার জন্য সহজ করে দেন তার জন্য এ কাজগুলো করা খুবই সহজ।**

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মুয়া'জের আবেদনের প্রেক্ষিতে জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার মৌলিক আ'মল বা কাজগুলো পরস্পর উল্লেখ করে বলেন ঃ

এক. تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا **তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।** প্রথমেই যে আ'মলের কথা আল্লাহ্র

রাসূল (সাঃ) বললেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈমান আনার সাথে সাথে যে আ'মলটি করতে হয় তা হলো আল্লাহ্‌র ইবাদত। কেননা আল্লাহ্ মানুষকে পয়দা করছেন তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করার উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَا اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ **আমি জ্বীন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে পয়দা করেছি। (যারিয়াত–৫৬)**। এই আয়াতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

ইবাদত কি ? عَابِدٌ (আ'বেদ) অর্থ গোলাম এবং عِبَادَةٌ (ইবাদাতুন) অর্থ গোলামী করা, বন্দেগী করা। সুতরাং গোলামের কাজই হবে মনিবের ইচ্ছা মাফিক সকল কাজ করা। নিজের ইচ্ছা মতো কোন কিছু না করা। যদি এটা করা হয় তাহলেই কেবল মাত্র তার মনিব বা মালিকের গোলামী করা হলো। সুতরাং সকল মনিব বা মালিকের মালিক মহান রাব্বুল আ'লামিনের মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো তাঁরই মর্জি মাফিক তাঁর বান্দা সকল কাজ করবে। তার আদেশ এবং নিষেধকে মান্য করবে। অতএব আল্লাহ্‌র ইবাদত বলতে মানুষের জীবনের প্রতিটি সময়, প্রতিটি মিনিট আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান মতো পরিচালিত করা। ঘুম হতে উঠা থেকে শুরু করে ঘুম যাওয়া পর্যন্ত সকল কাজ আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মতো পরিচালনা করা। এমনকি রাতের ঘুমকেও ইবাদতে পরিণত করা। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

যে ব্যক্তি জামায়াতের সাথে ঈশার নামায আদায় করে ঘুমালো সে যেন অর্ধেক রাত্রি ইবাদত করলো। আবার জামায়াতের সাথে ফজরের নামায আদায় করলো সে যেন পূর্ণরাত্রি ইবাদত করলো (মুসলিম)। অতএব বান্দার খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, কাজ-কাম, ঘুমা-জাগা, কথা-বার্তা, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-বাকরী, চাষ-বাস সকল কিছুই আল্লাহ্‌র বিধান মতো হওয়া। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মতো পরিচালিত করা। মোট কথা মুমিনের গোটা জীবন হবে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে ভরপুর। আর সেই ইবাদত হবে শিরক মুক্ত নির্ভেজাল ইবাদত। এই

সম্পর্কে হাদীসের পরের অংশে রাসূল বললেন ঃ لَا تُشْرِكَ بِهٖ شَيْـئًا তার **সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদত হবে শিরকমুক্ত নির্ভেজাল ইবাদত। আল্লাহ্‌র বন্দেগী করতে গিয়ে কাউকে বা কোন কিছুকে তার সমতুল্য বা সমকক্ষ বানানো যাবে না। মানুষের বদ অভ্যাস হলো- সামান্যতেই আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বানিয়ে নেয়া। অথচ আল্লাহ্ এটাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তিনি শিরককারীদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِا للّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে অবশ্যই আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। কেননা শিরক হলো এক প্রকার বড় যলুম। মহান আল্লাহ্ সূরা লোকমানে বলেন- اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ **নিশ্চয় শিরক হলো মস্তবড় যুলুম।** সুতরাং জান্নাত পেতে হলে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে হলে প্রথমেই যে আ'মল করতে হবে তা হলো শিরক মুক্ত নির্ভেজাল ইবাদত।

দুই. وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ **এবং নামাজ কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করবে।** নামাজ হলো মুসলমানিত্বের আইডেন্টিটি কার্ড বা পরিচয়পত্র। তার কারণ মুসলমান এবং কুফুরের মধ্যে পার্থক্যই হলো নামাজ। এই সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةَ **আবেদ (মুসলমান) এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ।** সুতরাং জান্নাত লাভ করতে হলে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে দ্বিতীয় যে আ'মলটি করতে হবে তা হলো নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। এখানে শুধু নিজেই নামাজ পড়া নয় বরং নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। নামাজ প্রতিষ্ঠা বলতে কতিপয় মুফাস্‌সীর বলেন– নামাজের যে সব বাইরের এবং ভিতরের শর্ত রয়েছে যেমন–পাক-পবিত্র হওয়া, সময় মতো এবং জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করা। নামাজের নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি মতো আদায় করা। রুকু-সিজদা সঠিক ভাবে করা। খুশু-খুজু ও বিনয়ের সাথে নামাজ আদায় করা। অর্থাৎ নামাজের পুরাপুরি হক আদায় করে নামাজ আদায় করা। সামাজিক ভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠা বলতে সমাজের নারী-পুরুষ সকলেই

নামাজ আদায় করা। কেউ বেনামাজী না থাকা। আর তখনই বলা হবে সামাজিক ভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সামাজিক ভাবে নামাজ কায়েম করতে হলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ

যখন তারা কেউ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে তখন তারা প্রথমেই নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হজ্জ-৪৯)

রাষ্ট্রীয় ভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য হলো, রাষ্ট্রের নাগরিকদের নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রকে সংশোধন করে সুনাগরিকে পরিণত করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয়ই নামাজ সকল প্রকার অশ্লীল এবং পাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।

তিন. وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ **এবং যাকাত আদায় করবে।** জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য রাসূল (সাঃ) তৃতীয় যে আ'মলের কথা বলেছেন তা হলো যাকাত আদায় করা। যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্য হলো ধনীদের ধন-সম্পদকে পবিত্র করা এবং গরীব-অসহায় এবং বেকারদের পূণর্বাসন করা। দেশ এবং জাতিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করা। ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থার প্রধান উপকরণ হলো যাকাত। যার উপর ভিত্তি করে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে এবং মানুষকে মহা পাপ সূদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু অপরাধ থেকে মুক্তি দেয়। এই জন্যই রাসূল (সাঃ) যাকাত আদায়ের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাত লাভের কথা বলেছেন।

চার. وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ **এবং রমযান মাসে রোজা রাখবে।** রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য চতুর্থ যে মৌলিক আ'মলের কথা বলেছেন, তা হলো– রমযান মাসে রোজাব্রত পালন করা। রোজা এমন একটা আ'মল বা ইবাদত যার মাধ্যমে তাক্ওয়ার গুন সৃষ্টি হয়। খোদাভীতি অর্জন করা যায়। রোজা নিছক আল্লাহ্ তাআলার জন্যই যে করা হয়ে থাকে তার প্রমাণ হলো এই ইবাদতটিতে লোক দেখানোর কোন সুযোগ

নেই। কেননা কোন রোজাদার মানুষের অগোচরে গোপনে কোন খাদ্য-খাবার বা পানীয় পান করে না। তার কারণ হলো, রোজা অবস্থায় কোন পানি পান বা খাদ্য-খাবার খেলে রোজা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই জন্যই শত কষ্ট হবার পরেও কোন রোজাদার খাবার খাই না এবং পানীয় পান করে না। এর পেছনে মূল কারণ হলো খোদা ভীতি বা আল্লাহ্র ভয়। আর এই জন্যই হাদীসে কূদসীতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِى بِهٖ **রোজা খাস করে আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমি নিজ হাতে দেব।** এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য আ'মল বা ইবাদত লোক দেখানো কিংবা দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধার জন্য হতে পারে, কিন্তু রোজার মধ্যে সেই সুযোগ নেই। সুতরাং এই তাক্‌ওয়ার গুন অর্জনকারী আ'মল বা ইবাদতই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে এবং জান্নাতে নিয়ে যায়।

পাঁচ. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ **এবং তুমি বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে।** রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত মুয়া'জের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার সর্বশেষ মৌলিক যে আ'মলের কথা বলেছেন, তা হলো বায়তুল্লাহ্ শরীফে হজ্জ পালন করা। অবশ্য এই আ'মলটি কেবলমাত্র ধনী লোকদের জন্য প্রযোজ্য। কেননা গরীব লোকদের পক্ষে বাইতুল্লাহ্ শরীফ যাবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। আর হজ্জ এমনই এক ইবাদত যার দ্বারা ধনীদের ধন-সম্পদের গৌরব এবং ক্ষমতাশীলদের ক্ষমতার আমিত্ববোধ ও গর্ব-অহংকারকে ধুলিসাৎ করে দিয়ে আখেরাতে মুক্তির পথকে সুগোম করে দেয়। মাবরুর হজ্জের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা হাজীদেরকে গোনাহ্- খাতা থেকে মুক্ত করে দিয়ে জান্নাতি বানিয়ে দেয়। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির আ'মল হিসেবে হজ্জের কথা উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রশ্নকারী মুয়া'জ (রাঃ) কে উত্তম আ'মলগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন ঃ اَلَا اَدُلُّكَ عَلَى اَبْوَابِ الْخَيْرِ আমি কি তোমাকে **কল্যাণের দরওয়াজাগুলো বলে দেবে না ?**

প্রশ্নবোধক এই কথা বলেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পরপর তিনটি কল্যাণের দরওয়াজার কথা উল্লেখ করেন।

প্রথম কল্যাণের দরওয়াজা ঃ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ রোজা ঢালস্বরূপ। অর্থাৎ ঢাল যেমন প্রতিপক্ষ শত্রুর তরবারীর আঘাতকে প্রতিহত করে ফিরিয়ে দেয়। অনুরূপ ভাবে রোজাও মানুষের চির শত্রু শয়তানের আক্রমনের থাবাকে বাধা সৃষ্টি করে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। ফলে মানুষ প্রতিরোধকারী রোজার কারণে বহু অন্যায়-অপরাধ মূলক কাজ থেকে বেঁচে জাহান্নাম থেকে নাজাত লাভ করে। আর এই জন্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোজাকে মানুষের জন্য কল্যাণের দরওয়াজা বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় কল্যাণের দরওয়াজা ঃ

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ وَالْمَاءُ النَّارَ

আর সাদকাহ্ গোনাহ্ সমূহকে এমন ভাবে রফা-দফা বা নিশ্চিহ্ন করে দেয় যেমন ভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে সাদকাহ্ বলে যাকাতকে বুঝিয়েছেন। তাছাড়া অন্যান্য দান-সাদকাহ্ও হতে পারে। মানুষের জন্য কল্যাণের দরওয়াজা সমূহের মধ্যে যাকাত এবং দান-খয়রাত কল্যাণের এমন এক দরওয়াজা যা আদায় করলে দাতার অসংখ্য (ছগীরা বা ছোট) গোনাহ্ সমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, আগুনের দাহিকা শক্তি বলতে কিছুই থাকে না।

সাদকাহ্ দাতার গোনাহ্ সমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এখানে গোনাহ্ বলতে ছগিরা বা ছোট গোনাহ্কে বুঝানো হয়েছে। কাবিরা বা বড় গোনাহ্ নিশ্চিহ্ন করতে হলে এস্তেগফার শর্ত। কেননা এস্তেগফার বা তাওবা ছাড়া কাবিরা গোনাহ্ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

তৃতীয় কল্যাণের দরওয়াজা ঃ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ **আর মানুষের গভীর রাতের নামাজও এভাবে গোনাহ্ সমূহ বিনষ্ট করে দেয়।** রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গভীর রাতের নামাজ বলতে তাহাজ্জুদের নামাজকে বুঝিয়েছেন। নফল ইবাদতের মধ্যে তাহাজ্জুদের নামাজ হলো আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় ইবাদাত। বান্দা যখন গভীর ঘুমের আরামকে হারাম করে মানুষের অগোচরে একাকি জায়নামাজে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলে অথবা কাঁদার ভান করে নামাজ আদায় করে তখন আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি মহা

খুশী হয়ে তার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ মাফ করে দিয়ে গোনাহ্ থেকে মুক্ত করে দেন। অত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাহাজ্জুদ নামাজের এবং নামাজীর ফজিলাতের কথা উল্লেখ করে সূরা আস্ সাজদাহর ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াত দু'টি তেলাওয়াত করেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ۝

তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে। তারা নিজেদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে। আর আমি তাদের জন্য যা কিছু রুজি বা জীবিকা দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। ফলে প্রতিদান হিসেবে তাদের জন্য চোখ জুড়ানো এমন জিনিস দেয়া হবে যা গোপন রাখা হয়েছে। কোন প্রাণীই যা জানে না।

এই আয়াত দু'টোতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়কারী এবং নিজের জীবিকা থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ কারীদের প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাতে এমন সব নিয়া'মত দেয়া হবে যা দেখলেই তাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। আর এই নিয়ামতগুলো এমনই যা দুনিয়ার কেউই দেখেনি। এসব জিনিস এই জন্যই গোপন রাখা হয়েছে যাতে বেশী আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ গোজার এবং দানকারী জান্নাতীরা যখন জান্নাতে এসব না দেখা আকর্ষণীয় জিনিস হঠাৎ করে দেখবে তখন তা দেখে তাদের চোখ জুড়ে যাবে এবং প্রশান্তিতে মন ভরপুর হয়ে যাবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্র হাদীসে কতিপয় বিভিন্ন পর্যায়ের আ'মলের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

اَلَا اُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذَرْوَةِ سَنَامِهٖ

(হে মুয়া'জ) আমি কি তোমাকে (দ্বীনের) সমস্ত কাজের মূল, তার কান্ড এবং

সর্বোচ্চ চূড়ার কথা বলবো না? এতে মুয়া'জ (রাঃ) বললেন ঃ

قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ-(দ্বীনের) যাবতীয় কাজের মূল হলো ইসলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে দ্বীনের 'কাজকে' গাছের সাথে তুলনা করেছেন। গাছ যেমন মূলের উপর ভিত্তি করে কান্ড এবং ডাল-পালা হয়ে নিজের প্রকৃত রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ও সৌন্দর্য বর্ধন করে। মূলের সাহায্যে মাটির রস সিঞ্চন করে তরু-তাজা হয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ফুলে-ফলে শুশোভিত হতে থাকে। অনুরূপ ভাবে দ্বীনের সমস্ত কাজের মূল হলো ইসলাম। এর উপর ভিত্তি করেই অন্যান্য আ'মল বা কাজগুলো সৌন্দর্য বর্ধন করে।

একজন ব্যক্তি কালেমা পড়ার মাধ্যমেই ইসলামে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। আর ইসলামে প্রবেশ করে অন্যান্য আ'মল বা কাজ করলে পর তাকে মুসলমান বলা হয়। সুতরাং মুসলমান এর মূল ভিত্তি হলো ইসলাম। ইসলামে প্রবেশ না করলে অন্যান্য কোন আ'মল বা কাজ তা দেখতে যতই উত্তম এবং নেক মনে হোক না কেন, আল্লাহ্‌র কাছে তার কোন মূল্য নেই। তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। সুতরাং আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে প্রথমেই তাকে কালেমার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। অতএব সকল কাজের মূল ভিত্তিই হলো ইসলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ এবং তার কান্ড হলো নামাজ। অর্থাৎ গাছের দ্বিতীয় অংশ হলো কান্ড। যার উপর ডাল-পালা, পাতা, ফুল ও ফলের মাধ্যমে গাছের প্রকৃত রূপ ধারণ করে। শুধু গাছের মূল থাকলেই তাকে গাছ বলা যাবে না তার কান্ডও থাকতে হবে। অনুরূপ ভাবে দ্বীনের যাবতীয় কাজের দ্বিতীয় অংশ (কান্ড) হলো নামাজ। অর্থাৎ দ্বীনের যাবতীয় কাজের মূল ইসলামে প্রবেশ করার পর পরই যে কাজটি করতে হয় তা হলো নামাজ। একজন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করার পর মুসলমান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে নামাজের মাধ্যমে। গাছ যেমন কান্ডের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করে, তেমনি মুসলমান নামাজের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করে। রাসূলুল্লাহ্

(সাঃ) বলেছেন بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةَ- বান্দা **(মুসলমান) এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ।** এই জন্যই আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে নামাজের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী তাগাদা দিয়েছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ **এবং উহার অর্থাৎ দ্বীনের কাজের সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ।"** গাছের তৃতীয় অংশ বা সর্বোচ্চ অংশ হলো ডাল-পালার চূড়া বা শীর্ষভাগ, যার দ্বারা আলো বাতাস সংগ্রহ্ করে গাছকে শুশোভিত করে শোভা বর্ধন করে এবং হাতছানি দিয়ে ডাকে। প্রতিকূল আবহাওয়ার মোকাবেলা করে গাছ নামক জিনিসের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। অনুরূপ ভাবে জিহাদও দ্বীনের সমস্ত কাজের শোভা বর্ধন করে এবং সমস্ত প্রতিকুলতাকে মোকাবেলা করে মুসলমানের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। জিহাদের মাধ্যমে ঈমানকে শানিত করে এবং অন্যদেরকেও দ্বীনের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানের মুসলমানিত্বকে ফুলে-ফলে শুশোভিত করে শোভা বর্ধন করে এবং দ্বীন নামের এই গাছটির পূর্ণাঙ্গতা দান করে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্র হাদীসের শেষাংশে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবগত করার জন্য বলেন ঃ

اَلَا اُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ **(হে মুয়া'জ) আমি কি তোমাকে ঐসবগুলোর মূল বা আসলটা বলে দেব না ?** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্র হাদীসে উপরোক্ত যে সমস্ত আ'মল বা কাজের কথা বর্ণনা করেছেন তার সবগুলোর মূল বা আসল জিনিসটি বলার জন্যই হযরত মুয়া'জকে এধরনের প্রশ্ন করেছেন। এতে হযরত মুয়া'জ বলেন ঃ

قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ **আমি বললাম ঃ হ্যাঁ বলে দিন হে আল্লাহ্র রাসূল।** তখন রাসূল (সাঃ) তাঁর জিহ্বা টেনে ধরে বললেন ঃ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا **এটাকে (জিহ্বাকে) তোমার নিয়ন্ত্রনে রাখবে।** রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে জিহ্বা বলতে জবান বা কথাকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষের জবান এমন একটা

গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে, রাসূল (সাঃ) এটাকে সকল কাজের আসল বা মূলের মূল বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ যে নিজের যবানকে নিয়ন্ত্রন করতে পারবে সে সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রন করতে পারবে। অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, অন্যান্য ভাল ভাল আ'মল এবং জিহাদ যাই হোক না কেন নিজের যবান যদি নিয়ন্ত্রন করা না যায় তাহলে যবানই সকল আ'মলকে ধ্বংস বা বরবাদ করে দেয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অন্য হাদীসে উল্লেখ করেন ঃ

مَنْ يَّضْمَنْ لِّىْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ-

যদি কেউ তার দু'টি জিনিস জিহ্বা (যবান) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান (লজ্জাস্থানের) গ্যারান্টি দিতে পারে তাহলে আমিও তার জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি দিতে পারি। (বুখারী)। কেননা যবান দ্বারাই মানুষ মিথ্যা বলে। গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা এবং চোগলখোরী করে। জবান দ্বারাই মানুষ মিথ্যা স্বাক্ষী দিয়ে প্রকৃত অপরাধীকে নিরাপরাধী বানায় এবং নিরাপরাধীকে অপরাধী বানায়। জিহ্বা বা যবান দ্বারাই মানুষ অশ্লীল কথা-বার্তা বলে। যবান দ্বারাই মানুষ মানুষকে গালমন্দ এবং কটু কথা বলে কষ্ট দেয়, অপমান অপদস্ত করে। যবান দ্বারাই মানুষ মানুষের সাথে কৃত ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। যবান দ্বারাই মানুষ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের বিধান ও আদর্শের বিরোধিতা করে। যবান দ্বারাই মানুষ হুকুকুল্লাহ্ (আল্লাহ্র হক) এবং হুকুকুলইবাদ (বান্দার হক) নষ্ট করে। সুতরাং দেখা যায় যবান বা কথাই হলো সবকিছুর মূল। সকল অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু। এই জন্যই রাসূল (সাঃ) যবান বা কথার এত গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। এই জন্যই তিনি সমস্ত আ'মল বা কাজের মূল হিসেবে জিহ্বা বা যবানকে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর মুয়া'জ বলেন ঃ

قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّا لَيُؤْخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمَ بِهِ

আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমরা স্বাভাবিক কথা-বার্তায় যা বলে থাকি তার জন্যেও কি পাকড়াও হবো ? অর্থাৎ রাবী হযরত মুয়া'জ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছেন যে, আমরা দুনিয়ায় চলা-ফেরা, সংসার ও সমাজ পরিচালনা এবং অন্যান্য প্রয়োজনে যে সব কথা-বার্তা বলে থাকি তার

জন্যও কি আল্লাহ্‌র কাছে পাকড়াও হবো ? তার কারণ, কথা না বললে তো দুনিয়ায় চলা যায় না এবং সামাজিকতা রক্ষা পায় না। প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মুয়া'জ কে বললেন ঃ

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ-

মানুষকে তো তার জিহ্বা বা যবান দ্বারা উপার্জিত জিনিসের কারণেই জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। এই কথার দ্বারা রাসূল (সাঃ) বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মানুষকে তো স্বাভাবিক কথা-বার্তা বলতেই হবে। কিন্তু স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা যা নিজের পরিবারের, সমাজ ও রাষ্ট্রের এবং দ্বীনের কোন কাজে আসে না। যে কথার মধ্যে কোন কল্যাণ এবং উপকার নেই, এমন কথা-বার্তার জন্যই আল্লাহ্ তাআলা পাকড়াও করবেন। নিজের পরিবারের, সমাজ এবং রাষ্ট্রের কোন ক্ষতিকর কথা। মিথ্যা, অশ্লীল, কটু ও অপবাদ মূলক কথার জন্যই আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এমনকি অপমানের সাথে উপুড় করে পা ধরে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সুতরাং আমাদেরকে সব সময় কথা-বার্তার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কম এবং প্রয়োজনীয় কথা বলতে হবে। কেননা বেশী কথা বললে বেশী ভুল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও অন্য এক হাদীসে কম কথা এবং মেপে মেপে কথা বলার তাগাদা দিয়েছেন। চুপচাপ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। অতএব আমাদের কথা-বার্তার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে দারস পেশ করলাম এ থেকে আমাদের জন্য যে সব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা হলো–

✪ প্রত্যেক মুমিন বান্দাহ্-বান্দীর জাহান্নাম থেকে নাজাত লাভ করে জান্নাত যাবার তীব্র আকাংখা থাকা উচিত এবং সে অনুযায়ী আ'মল করা উচিত।

✪ জান্নাতে যাবার তীব্র আকাংখী ব্যক্তিদের আ'মল গুলোকেও আল্লাহ্ তাআলা সহজ করে দেন। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়া'মত।

✪ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করতে হবে।

✪ আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত- বন্দেগী হবে শিরক মুক্ত। তাঁর জাত, তাঁর সিফাত এবং তাঁর ক্ষমতার সাথে কাউকে বা কোন কিছুকে সামান্যতমও অংশীদার স্থির করা যাবে না।

✪ নামাজের হক আদায় করে নামাজ পড়তে হবে। নিজ পরিবারের (দশ বছর থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত) সকলকে নামাজি বানাতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জিহাদে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

✪ নিসাবের অধিকারী ব্যক্তিদের বছরান্তে সম্পদের সঠিক হেসাব-নেকাশ করে যাকাত আদায় করে অসহায় বেকার এবং দরিদ্রদের পুনর্বাসিত করে অভাব দূর করতে হবে। যাকাত যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থার আয়ের মূল উৎস এবং রাষ্ট্রীয় ভাবেই যাকাত বিতরণ করার বিধান রয়েছে, সেইহেতু ইসলাম অর্থব্যবস্থা চালুর জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থাকতে হবে।

✪ প্রতিটি মুমিন-মুসলমানকে রমযান মাসে সঠিক নিয়মে এবং সঠিক পদ্ধতিতে রোজাব্রত পালনের মাধ্যমে তাক্ওয়ার গুন অর্জন করতে হবে।

✪ দৈহিক এবং আর্থিক ভাবে সামর্থবান ব্যক্তিদের অবশ্যই হজ্জ পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্র একটা মৌলিক ফরজ ইবাদত পালন করে নিজেকে গোনাহ থেকে মুক্ত করতে হবে।

✪ উত্তম এবং কল্যাণের দরওয়াজা গুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

i) রোজা হলো ঢালস্বরুপ। ঢাল যেমন শত্রুর তরবারীর আঘাতকে প্রতিহত করে ফিরিয়ে দেয়, অনুরূপ ভাবে রোজাও শয়তানের অসওয়াসা কে প্রতিহত করে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। সুতরাং রমযানের রোজার মাধমে তাক্ওয়ার গুন অর্জন করে গোনাহ্ থেকে দূরে থাকতে হবে।

ii) দ্বিতীয় কল্যাণের দরওয়াজা হলো সাদকাহ বা যাকাত ও অন্যান্য দান-খয়রাত। এ এমন এক আ'মল যে আমল করলে জীবনের ছোট ছোট অসংখ্য গোনাহকে পাক-সাফ করে দেয়, যেমন ভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

iii) তৃতীয় কল্যাণের দরওয়াজা হলো গভীর রাতের নামাজ অর্থাৎ তাহাজুদের

নামাজ। এ নামাজ ছগিরা গোনাহ্ গুলোকেও পাক-সাফ করে মুক্ত করে দেয়। সুতরাং প্রতিটি মুমিন-মুমিনার উচিত এই নামাজে অভ্যস্ত হওয়া। গভীর রাত্রে নামাজের মাধ্যমে সরাসরি মহান আল্লাহ্র কাছে নিজের যাবতীয় কামনা-বাসনা পেশ করা।

iv) হাদীসে আরো উল্লেখ রয়েছে সকল কাজের মূল হলো ইসলাম। তার কান্ড হলো নামাজ এবং সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ। সুতরাং আমাদেরকে পূর্ণ মুসল-মান হতে হলে ইসলামে প্রবেশের মাধ্যমে তার যথার্থ নির্দেশ পালন করতে হবে। যথাযথ ভাবে নামাজ আদায় করে মুসলমানিত্বের পরিচয় দিতে হবে। জিহাদের মাধ্যমে ঈমানকে শানিত করতে হবে এবং ইসলামের পরিপূর্ণতা দান করতে হবে।

v) হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জাহান্নাম থেকে দূরে থেকে জান্নাত লাভের যে সব আ'মলের কথা উল্লেখ করেছেন তার সব কিছুর মূলে হলো নিজের জিহ্বা বা যবান। যবানকে নিয়ন্ত্রন করতে পারলেই জান্নাত যাওয়া যাবে। আর নিয়ন্ত্রন করতে না পারলে জাহান্নামে যেতে হবে। কেননা নিয়ন্ত্রনহীন যবান সমস্ত আমলকে ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ এর দ্বারা হুকুকুল্লাহ (আল্লাহ্র হক) এবং হুকুকুল ইবাদ (বান্দার হক) উভয় নষ্ট করে দেয়। এই জন্য আমাদেরকে কম কথা বলতে হবে। মেপে মেপে কথা বলতে হবে। লাগামহীন কথা বলা যাবে না।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে আল্লাহ্র রাসূলের (সাঃ) যে দীর্ঘ হাদীস পাঠ, অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর অত্র হাদীসে জান্নাত যাবার যতগুলো কাহের কথা আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তা যেন আমরা বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি।

মাআসসালাম।

সাত

রিয়া বা লোক দেখানো কাজ থেকে বাঁচার উপায়

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَنْ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ، اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ مُعَاذًا عِنْدَ قَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْكِىْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ : حَدِيْثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْيَسِيْرُ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَمَنْ عَادٰى اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ فَقَدْ بَارَزَاللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ، اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الاَبْرَارَ الاَتْقِيَاءَ الاَخْفِيَاءَ اَلَّذِيْنَ اِنْ غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا، وَاِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُعْرَفُوْا، قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى، يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ (اِبْنِ مَاجَه الحَاكِمْ وَالْبَيْهَقِىْ)

অনুবাদ ঃ হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। একবার হযরত উমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখতে পান যে, হযরত মুয়া'জ (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর কবরের কাছে কান্নাকাটি করছেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কাঁদছো কেন ? মুয়া'জ বললেন ঃ রাসূল (সাঃ) এর একটা হাদীস (কথা) মনে করে আমি কাঁদছি। তিনি বলেছেন ঃ সামান্য পরিমাণ রিয়াও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকদের সাথে

শত্রুতা পোষণ করে সে যেন স্বয়ং আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ্‌র প্রিয় লোক তারাই যারা সৎ কর্মশীল, খোদাভীরু, লোকচক্ষুর আড়ালে সৎ কাজ করে, যারা অনুপস্থিত থাকলেও (মানুষের স্মৃতি থেকে) হারিয়ে যায় না। আর সবার মাঝে বিরাজমান থাকলেও অচেনা থেকে যায়। যাদের অন্তর হেদায়েতের মশালস্বরূপ এবং যারা কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন প্রান্তর থেকেও বেরিয়ে আসে। (ইবনে মাজাহ্, হাকেম ও বায়হাকী)।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ – থেকে বা হতে। اَبِيْهِ তার বাপ। خَرَجَ- বের হলেন। اِلٰى – দিকে। فَوَجَدَ – অতঃপর পেলেন। عِنْدَ قَبْرٍ- কবরের কাছে। يَبْكِىْ- সে কান্নাকাটি করছে। مَا يُبْكِيْكَ- তুমি কাঁদ কেন ? حَدِيْثٌ- কথা বা বাণী। سَمِعْتُهٗ- তাঁর কথা শুনে বা মনে করে। مِنْ – থেকে বা হতে। اَلْيَسِيْرُ – সামান্য পরিমাণ। رِيَاءٌ- লোক দেখানো। شِرْكٌ – শিরক বা অংশীদার বানানো। وَمَنْ- এবং যে কেউ। - عَادٰى –শত্রুতা। اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ- আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র। بَارَزَ اللّٰهَ- আল্লাহ্‌র সাথে লিপ্ত হয়। مُحَارَبَهٖ- যুদ্ধে। اِنَّ اللّٰهَ- নিশ্চয় আল্লাহ্। يُحِبُّ- তিনি ভালবাসেন। اَبْرَارَ – নেক্কার বা সৎ কর্মশীল। اَتْقِيَاءَ–চরম খোদাভীরু। اَخْفِيَاءَ – গোপনে। اَلَّذِيْنَ- যারা। اِنْ- যদি। غَابُوْا- অনুপস্থিত থাকে। لَمْ يُفْتَقَدُوْا – হারিয়ে যায় না। وَاِنْ – এবং যদি। حَضَرُوْا- উপস্থিত বা বিরাজমান থাকে। لَمْ يُعْرَفُوْا – পরিচিত হয় না বা অচেনা থাকে। قُلُوْبُهُمْ – তাদের অন্তরসমূহ। مَصَابِيْحُ- বাতি বা মশাল। اَلْهُدٰى- পথ বা নির্দেশিকা। يُخْرِجُوْنَ – তারা বের হয়। كُلٌّ - প্রত্যেকে। غَبْرَاءُ – নির্জন পান্তর। مُظْلِمَةٍ- – অন্দকারাচ্ছন্ন।

সম্বোধন ঃ দারসে হাদীস প্রোগ্রামে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনি/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে বিশিষ্ট রাবী এবং সাহাবী যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি পাঠ এবং তরজমা করেছি। আল্লাহ্‌পাক যেন আমাকে হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তাওফীক দান করেন।

হাদীসটি বর্ণনার সময়কাল ঃ যদিও হযরত উমর (রাঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীসটা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদীসের মূল বক্তব্য হযরত মুয়া'জের মাধ্যমে রাসূলের কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুয়া'জ (রাঃ) নিজে রাসূলের এই হাদীসটা শুনেছেন। আর মুয়া'জ (রাঃ) মদীনাবাসী ছিলেন। সুতরাং এতে বুঝা যায় হাদীসটা রাসূল (সাঃ) মাদানী জীবনে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়াও হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল করলে বুঝা যায় হাদীসটা মাদানী জিন্দেগীতে বর্ণিত হয়েছে। এর পরও আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।

হাদীসটি বর্ণিত কেতাবের পরিচয় ঃ হাদীসটা তিনটি হাদীসের কেতাবে উল্লেখিত হয়েছে। তার মধ্যে 'সিহাহ্ সিত্তাহ' ভুক্ত কিতাব 'ইবনে মাযাতে' বর্ণিত হয়েছে। আরও দু'টো বিশিষ্ট হাদীসের কেতাব 'হাকেম' এবং 'বাইহাকীতেও' বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটা সহীহ্ নয় এমন কোনো মন্তব্য কেউ করেননি। সুতরাং ধরে নেয়া যায় হাদীসটা সহীহ্ বা বিশুদ্ধ।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে হাদীস পাঠ, অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত কিছু প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরেছি। এখন হাদীসটার মূল ব্যাখ্যা পেশ করছি। বিশিষ্ট বর্ণনাকারী ও অহী লেখক আনসারী সাহাবী হযরত মুয়া'জ (রাঃ)কে রাসূল (সাঃ) এর কবরের কাছে বসে কাঁন্নাকাটি করতে দেখে হযরত উমর (রাঃ) তাকে কাঁন্নাকাটির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

حَدِيْثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর একটা হাদীস বা কথা মনে করে কাঁদছি। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বা কথা বলে গিয়েছিলেন যা মসজিদে নববীর ধারে তাঁর কবরের কাছে এসে মনে পড়ে গিয়ে এমন আবেগ

এবং ভয় পয়দা হয়েছে যে এমনিতেই কাঁদন এসে গেছে। (এখানে জানার বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ওফাতের পর মসজিদে নববীর পাশে নিজ ঘরের মধ্যেই তাঁর দাফন দেয়া হয়। বর্তমানে মসজিদ সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে রাসূলের মাজার মসজিদের প্রায় মাঝখানে পড়ে গেছে। সেখানে যাতে কেউ কবর নিয়ে শিরক এবং বিদআ'ত করতে না পারে সে জন্য সউদী সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।) সেই ভয় ও আবেগ জড়িত গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো হলো–

اَلْيَسِيْرُ مِنَ الرِّيَاءِ **সামান্য পরিমাণ রিয়া বা লোক দেখানো কাজও শিরকের অন্তর্ভুক্ত**। রিয়া অর্থ দেখানো। অর্থাৎ সৎ, ভাল, কল্যাণকর এবং নেক কাজ করতে যেয়ে যদি মনের মধ্যে সামান্য পরিমাণও রিয়া বা লোক দেখানো কিংম্বা প্রদর্শনেচ্ছা থাকে তাহলে তা শিরকের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে। কেননা প্রতিটা ভাল এবং নেক আ'মল তো কেবলমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। শুধু উচিতই নয়, এটা আল্লাহ্র হক বা প্রাপ্য। কিন্তু তার মধ্যে যদি মানুষের সন্তুষ্টি অথবা দৃষ্টি আকর্ষণ কিংম্বা বাহবা পাবার আশা এবং সুনাম-সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্য মিশ্রন হয়ে যায়, তা হলে তা আল্লাহ্র সাথে শরীক বা অংশীদার বানিয়ে দেয়া হয়। অন্য এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) লোক দেখানো এবাদতকে শিরক এর সাথে তুলনা করে বলেন ঃ

مَنْ صَلّٰى يُرَائِى فَقَدْ اَشْرَكَ؛ وَمَنْ صَامَ يُرَائِى فَقَدْ اَشْرَكَ؛ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ

যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়লো সে শিরক করলো। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে রোজা রাখলো সে শিরক করলো। আর যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করলো সেও শিরক করলো। (মুসনাদে আহমদ)

সুতরাং বান্দার প্রতিটা ইবাদত-বন্দেগী বা কাজ হবে একমাত্র আল্লাহ্ তাআ'লার জন্যে, তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। যার মধ্যে সামান্য পরিমাণও লোক দেখানো বা প্রদর্শনেচ্ছার কোনো পরিকল্পনা বা ইচ্ছা থাকবে না। অতএব মূর্তি পূজা, কবর পূজা এবং দেবদেবীর পূজাই কেবলমাত্র শিরক, তা নয়। বরং হাদীস অনুযায়ী এবাদত-বন্দেগী এবং সৎ কাজের মধ্যেও শিরক হয়ে যায়, যদি তার

মধ্যে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ বা সন্তুষ্টির সংমিশ্রণ ঘটে।

শিরক মানে হলো আল্লাহ্‌র অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। তার কারণ, ইবাদত-বন্দেগী এবং সৎ কাজ করা মানে হলো আল্লাহ্‌র হক বা অধিকার আদায় করা। সুতরাং যে ইবাদত-বন্দেগী এবং সৎকাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে মানুষের সন্তুষ্টির জন্যে করে সে আল্লাহ্‌র হক বা অধিকার ক্ষুণ্ন করে। রাসূল (সাঃ) এ সম্পর্কে অপর এক হাদীসে হযরত মুয়া'জকে আল্লাহ্‌র হক এবং বান্দার হক বুঝাতে গিয়ে বলেন ঃ

فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَّا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا-

বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক বা অধিকার হলো এই যে, তারা এমন ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে যে, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্‌র উপরে বান্দার হক বা অধিকার হলো এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন না।

(বুখারী মুসলিম)

সুতরাং আমাদের প্রতিটি সৎ কাজ, প্রতিটি ইবাদত-বন্দেগী, যুদ্ধ-জিহাদ, আন্দোলন-সংগ্রাম নিছক আল্লাহ্ তাআলার রাজি খুশি এবং সন্তুষ্টির জন্যই হবে। তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ রিয়া বা লোক দেখানোর ইচ্ছা বা বাসনা থাকবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সব কিছুই বিশ্বি প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআ'লার জন্যে। (সূরা-আনয়াম-১৬২)

হযরত মুয়া'জ (রাঃ) কাঁদার কারণ উল্লেখ করে হাদীসের পরবর্তী অংশে বলেনঃ

وَمَنْ عَادٰى اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِا الْمُحَارَبَةِ–

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকদের সাথে শত্রুতা করে সে যেন স্বয়ং **আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।** এই অংশে রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকদের বিরাট মর্যাদা এবং সম্মানের কথা উল্লেখ করেছেন। তার কারণ, যারা আল্লাহ্‌র প্রিয় লোক তাদের সাথে শত্রুতা করা বা মনের মধ্যে শত্রুতা পোষণ করা মানেই হলো আল্লাহ্‌র সাথে শত্রুতা করা। আর আল্লাহ্‌র সাথে শত্রুতা করা মানে আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া মানেই হলো নিজেকে ধ্বংস করে দেয়া। কেননা যুদ্ধ তো শত্রুদের সাথেই করা হয় মিত্রদের সাথে নয়।

সুতরাং আমাদের উচিত যারা আল্লাহ্‌র প্রিয় লোক তাদেরকে ভালবাসা। তাদের সাথে মহব্বত ও ভালবাসা পয়দা করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা। চাই তাকে পছন্দ হোক বা না হোক। তার কারণ পছন্দ-অপছন্দ তো আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত, বান্দার ইচ্ছার-অনিচ্ছার উপর নয়। রাসূল (সাঃ) এই সম্পর্কিত লোকদেরকে ঈমানদার বলে উল্লেখ করে অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ–

যে কাউকে ভালবাসলো একমাত্র আল্লাহ্ তাআ'লার সন্তুষ্টির জন্যে, আবার কারো সাথে শত্রুতা করলো তাও আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে। কাউকে দান করলো একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে, আবার কাউকে দান করা বন্ধ করে দিলো তাও আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে। সে যেন তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করলো। (বুখারী)

অতএব আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকদেরকে ভালবাসতে হবে। তাদের সাথে কোনো ভাবেই শত্রুতা বা দুষমনি পোষণ করা যাবে না। অপর পক্ষে যারা আল্লাহ্‌র অপ্রিয় লোক তাদেরকে যেমন ভালবাসা যাবে না, তেমনি তাদেরকে সাহায্য-সহযোগীতাও করা যাবে না।

এখন আমাদের জানা দরকার যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় লোক কারা। প্রিয় লোকদের বৈশিষ্ট্য বা গুনাবলীই বা কি ? এই সম্পর্কে হাদীসের পরবর্তী অংশে রাসূল

(সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকদের পরপর সাতটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

এক. اَلْاَبْرَارُ **তারা হবে নেককার বা সৎকর্মশীল**। আল্লাহ্‌র প্রিয় লোক বা বান্দার প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তারা হবে নেককার এবং সৎ কর্মশীল। নেক এবং সৎকর্ম বলতে বুঝায়– আল্লাহ্ তাআ'লা যা আদেশ করেছেন তা পুরোপুরিভাবে পালন করা। আর যা তিনি নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করা। অর্থাৎ যতো ভাল ও সৎ কাজ আছে তা করা এবং যতো মন্দ এবং খারাপ কাজ আছে তা থেকে দূরে থাকা, পরহেজ করে চলা।

আমাদের সমাজে অধিকাংশ লোকই সৎআমল বা সৎকর্ম বলতে বুঝে থাকে গুটি কয়েক ইবাদত-বন্দেগী এবং তস্‌বীহ-তাহ্‌লীলকে। আসলে এগুলো সৎ কর্মের একটা অংশ। কেবলমাত্র এই গুটি কয়েক কাজই সৎকর্ম নয়। বরং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি মোট কথা মানুষের জীবনে যতো বিভাগ আছে সকল ক্ষেত্রে সৎ আ'মল বা সৎ কাজ করাকেই সৎকর্ম বলা হয়। আর যারা এসব সৎ কাজ করে তাদেরকেই বলা হয় সৎকর্মীশীল বা নেক্‌কার লোক। সুতরাং যখনই কোনো বান্দা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত প্রতিটি সৎকাজ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করে এবং নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করে চলে তখনই সে সৎকর্মশীল, নেক্‌কার এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র হয়ে যায়।

দুই. اَلْاَتْقِيَاءُ **তারা হবে খোদাভীরু**। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রিয় লোক বা পাত্র হবে তারা যারা মুত্তাকী, পরহেযগার, খোদাভীরু। তারা আল্লাহ্‌কে হৃদয় দিয়ে এমন ভয় করে যে, মানুষের অগোচরে কোনো অন্যায় বা পাপ কাজ করে না। পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে না। আল্লাহ্‌র ভয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সকল কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করে এবং আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ এবং হারাম কাজ থেকে দূরে থাকে। হারাম কাজের ধারে কাছেও যায় না। এমন কি হারামের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে অনেক হালাল বা বৈধ জিনিসও পরিহার করে। হযরত ওমরে ফারুক (রাঃ) বলেন ঃ **হারামে জড়িয়ে যাবার ভয়ে হালাল জিনিসের দশ ভাগের নয় ভাগই বাদ দিতাম এবং এক ভাগ গ্রহণ করতাম**। তাকওয়ার কারণে তারা বৈধ জিনিসের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে তা ত্যাগ করে। এই সম্পর্কে রাসূল পাক (সাঃ) বলেন ঃ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ তুমি

সন্দেহযুক্ত জিনিস বর্জন করো এবং সন্দেহবিহীন জিনিস গ্রহণ করো। (আবু দাউদ-আহমদ)

আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র খোদা ভীরু লোকেরা প্রতিটা কাজ তাঁরই সন্তুষ্টি এবং রাজি-খুশির জন্যে করে। কেননা তারা জানে যে, কোনো সৎকাজ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করলে তা শিরকের মধ্যে গণ্য হবে। এই জন্য তারা কে খুশী হলো আর কে বেজার হলো তার দিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে না। আল্লাহ্‌র ভয় ও ভক্তিতে তাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। তাদের প্রতিটি কাজ ও আ'মল আল্লাহ্‌র ভয় ও ভক্তির জন্যেই হয়ে থাকে। আর এই জন্যই তারা আল্লাহ্‌র প্রিয় ও ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়ে যায়। সূরা তাওবার ৪ নং বা আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকীদেরকে ভাল-বাসেন। আল্লাহ্ কি শুধু মুত্তাকীদের ভালবাসেন তাই নয়, বরং তারা তাঁর বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। সূরা জারিয়ার ১৯ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, اَللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ **আল্লাহ্ মুত্তাকীদের বন্ধু।**

রিয়া থেকে মুক্ত খোদাভীরু লোকেরা শুধু আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র এবং ভালবাসার বন্ধু হয়ে যায় তা নয়, বরং আল্লাহ্ তাআ'লা তাদেরকে মানুষের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা দান করেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ **নিশ্বয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সেই সর্বাধিক মর্যাদাশীল যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক খোদাভীরু।**

তিন. اَلْاَخْفِيَاءُ তারা গোপনে সৎ কাজ করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকেরা গোপনে লোক চক্ষুর অন্তরালে সৎ কাজ করে থাকে। এরা লোক দেখানো কোনো কাজ করে না। তারা লোক দেখানো কাজ মোটেই পছন্দ করে না। আল্লাহ্‌কে দেখানো কাজে তাদের অন্তর প্রশান্তি পায়। পক্ষান্তরে মানুষ দেখানো কাজে তাদের অন্তর অশান্তিতে ছটফট করে। মোটেই প্রশান্তি পায় না। তার কারণ তারা জানে যে, লোক দেখানো কাজে 'রিয়া' পয়দা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সামান্য রিয়াও শিরকের মধ্যে গণ্য হয়। আর এই শিরকের গুনাহ্‌র কারণে সৎ কাজ করার পরও জাহান্নামে যেতে হবে। জান্নাত ভাগ্যে জুটবে না। মহান আল্লাহ্‌র বলেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِا للّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে।

সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকেরা লোক চক্ষুর অন্তরালে গোপনে সৎ কাজ করার মাধ্যমেই প্রশান্তি লাভ করে।

চার. اَلَّذِيْنَ اِنْ غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا **যারা অনুপস্থিত থাকলেও হারিয়ে যায় না।** আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো যদি তারা কোনো সমাবেশ বা লোকারন থেকে অনুপস্থিত থাকে অথবা মৃত্যু বরণ করে ইহলোক ত্যাগ করে চলে যায়, তবুও তারা মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায় না, বরং সকলের মাঝে বিরাজমান থাকে। এর কারণ হলো আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা এমন রিয়ামুক্ত নীরব আ'মল করে, তাদের আচার-আচরণ এবং ব্যবহারিক জিন্দেগী এতো উত্তম এবং স্মৃতিময় যে, তারা মানুষের অন্তরের অন্তরস্থলে স্থান করে নেয়।

তাদের আ'মল বা কার্যক্রম মানুষের মাঝে এমন আকর্ষণ পয়দা করে যে, মানুষ তাদের অনুপস্থিতিতেও তাদের স্মৃতিময় জীবনকে ভুলতে পারে না। মানুষ তাদের অগোচরে তাদের স্মরণ করে এবং সুনাম-সুখ্যাতি বর্ণনা করতে থাকে। সুতরাং এসব রিয়ামুক্ত, নিরহংকারী ব্যক্তিরা যেমন মানুষের প্রিয় পাত্র হয়ে অন্তরে স্থান করে নেয়, তেমনি আল্লাহ্ তাআলারও প্রিয় লোকে পরিণত হয়ে যায়।

পাঁচ. وَاِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُعْرَفُوْا **এবং তারা সবার মাঝে বিরাজমান থাকলেও নিজেদেরকে প্রকাশ করে না।** অর্থাৎ তারা আত্ম পরিচয়ের মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভ করে না। সমাজে অনেকে এমন আছে যারা নিজেকে জাহির বা প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন প্রকার পথ ও পন্থা অবলম্বন করে থাকে। মানুষের মাঝে নিজেকে প্রকাশ বা পরিচিতি করতে পারলে তারা আত্মতৃপ্তি বোধ করে। আর যদি নিজেকে প্রকাশ করতে না পারে তাহলে মনটা বেজার হয়ে যায়। এটা একটা মস্তবড় রোগ। রাজনৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেসব কাজে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় অথবা নিজে পরিচিত হওয়া যায় সেইসব কাজে বেশী আগ্রহী হয় এবং চেষ্টা-

তদবীরও চালায়। এমনকি ইসলামী আন্দোলন করার পরেও আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে কারো কারো এ ধরনের রোগ দেখা যায়। অথচ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা তারাই যারা মানুষের সাথে চলা-ফেরা উঠা-বসার পরেও নিজেকে জাহির করার জন্য চেষ্টা-ফিকির করে না। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দ্বীনের কাজ করার পরও তারা অপরিচিত থেকে যায়। কেননা তারা জানে যে লোক দেখানো কাজ বা নিজেকে বেশী জাহির করার কাজের মধ্যে রিয়া পয়দা হয় এবং রিয়া শিরকের মধ্যে গণ্য হয়ে জাহান্নামে নিয়ে যায়। তবে এটা নয় যে, তারা সবার মাঝে বিরাজ করে অথচ কাজ করে না। আসলে এটা নয়, তারা দ্বীনের কাজ করে তবে নীরবে কাজ করে। তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করে এই জন্য যে, তার কাজের কারণে মানুষ তার সামনে সুনাম-সুখ্যাতি বর্ণনা করবে আর এতে তারা অন্তরে অহমিকা পয়দা হয়ে বিপথগামী হবে। এই জন্য তারা কাজ করে কিন্তু অপরিচিত থেকে যায়। তবে মৃত্যুর পর মানুষ টের পায় তাদের অনুপস্থিতির অভাব। সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রিয় লোক তারাই যারা মানুষের মধ্যে বিরাজমান থেকে কাজ করার পরও নিজেকে অপরিচিত রেখে দেয়। অতএব দ্বীনের কাজ এবং সামাজিক কাজ খুব সতর্কতার সাথে করা, যাতে মানুষের প্রশংসার পাত্রে পরিণত হয়ে না যায়। তাদের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্‌কে দেখানো এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা, আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্রে পরিণত হওয়া।

ছয়. قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدَا তাদের অন্তর হেদায়েতের মশাল স্বরূপ।

আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকদের ষষ্ঠ গুন হলো তাদের কলব বা অন্তর হেদায়েতের মশাল বা আলোকস্বরূপ। মশাল যেমন কোনো অন্ধকার পথকে আলোকিত করে মানুষকে পথ দেখার বা পথ চলার জন্য সাহায্য করে। তেমনি আল্লাহ্‌র নেক্‌কার এবং প্রিয় বান্দাহদের অন্তর এতো পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল এবং রিয়ামুক্ত যে, তাদের এই পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন অন্তর বিপথগামী মানুষকে জাহেলী পথ থেকে মশালের মতো হেদায়াতের পথ দেখিয়ে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেয়।

সাত. يَخْرِجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ তারা কোনো অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন প্রান্তর থেকেও বেরিয়ে আসে। হাদীসের আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের সপ্তম এবং সর্বশেষ যে বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেন তা হলো, যারা কোনো অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন নিরিবিলি স্থান থেকেও বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ তারা

দূর্গম ও নির্জন স্থানে বসবাস করে। এই জন্য যে, তারা দুনিয়াতে খ্যাতি অর্জন ও রিয়া থেকে বাঁচতে চায়। মানুষের মধ্যে থাকলে বেশী পরিচিতি হয়ে যাবে, সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়ার মোহে দুনিয়াদারীতে ঝুঁকে পড়বে এবং রিয়া বা লোক দেখানো কাজের মাধ্যমে শিরকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে চলে যাবে এই ভয়ের জন্যই তারা প্রয়োজনে লোকচক্ষুর সামনে থেকে দূর্গম, নির্জন স্থানে চলে যায়। এর মানে এই নয় যে, তারা সমাজ থেকে দূরে চলে যায় বা সমাজচ্যুত থাকে। তার কারণ সমাজ থেকে দূরে থাকা ইসলামের কাজ নয়। সমাজের মধ্যে থেকেই দ্বীন পালন করতে হবে। কেননা সমাজে উঠা-বসা করা এবং সমাজ পরিচালনা করাও একটা দ্বীনের কাজ। তাদের উদ্দেশ্য সমাজ থেকে দূরে থাকা বা বিচ্ছিন্ন থাকা নয়, বরং আল্লাহ্‌র ভয়ে রিয়া থেকে মুক্ত থাকার জন্যই তাদের এই মানসিকতা এবং এই অভ্যাস। কেননা যাদের মধ্যে এই মানসিকতা থাকে তারাই আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকের মধ্যে গণ্য হয়।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! হযরত মুয়া'জ (রাঃ) রাসূলের কবরের ধারে বসে যে জন্য কাঁদছিলেন তা ছিলো রাসূলের সেই হাদীস মনে পড়ে যেখানে তিনি রিয়া বা লোক দেখানো কাজের কথা বলেছেন। আর সামান্য পরিমাণ রিয়াকেও তিনি শিরকের মধ্যে গণ্য করেছেন। আর শিরক তো আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হয়ে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। সুতরাং তিনি সেখানে বসে কাঁন্নাকাটি করছিলেন একমাত্র জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা শিরক কারীদের জন্য জান্নাতে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। অন্য এক হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "বিচারের দিন-হাশরের ময়দানে বান্দা তার গোনাহর ডালি নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হবে। আল্লাহ্ দয়া করে বান্দার অন্যান্য গোনাহ্ মাফ করে দিলেও তিনি শিরকের গোনাহ মাফ করবেন না"। কেননা শিরক হলো আল্লাহ্‌র উপর যুলুম। সূরা লোকমানে মহান আল্লাহ্ বলেন- ان شرك لظلم عظيم নিশ্চয় শিরক হলো মস্তবড় যুলুম।

দরসের জন্য পঠিত হাদীসে রিয়া বা লোক দেখানো কাজকে শিরকের মধ্যে

গণ্য করা হয়েছে। আর কোন্ আ'মল বা কাজের দ্বারা রিয়া থেকে মুক্ত থাকা যায় তারও উল্লেখ করা হয়েছে। আর রিয়ামুক্ত আ'মলের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্‌র প্রিয় লোক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এবং রিয়ামুক্ত এসব গুণের অধিকারী আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকদের সাথে শত্রুতা করতে বারন করা হয়েছে। তার কারণ হলো, আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকদের সাথে শত্রুতা করা মানে হলো আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। আর আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া মানেই হলো নিজেকে ধ্বংস করা। সুতরাং আমাদেরকে এসব ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক সাবধান থাকতে হবে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো এতে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় রয়েছে তা হলো–

✪ সৎ আ'মল করতে যেয়ে অন্তরে সামান্য পরিমাণ রিয়াও যেন সৃষ্টি না হয় সেই ব্যাপারে সদা-সর্বদা সতর্ক সাবধান থাকতে হবে। বিশেষ করে যারা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন তাদেরকে বেশী সতর্ক থাকতে হবে। কেননা সামান্য পরিমাণ রিয়া বা লোক দেখানো কাজও শিরকের মধ্যে গণ্য হবে।

✪ নেক্‌কার, সৎ কর্মশীল আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন লোকদের সাথে শত্রুতা তো করা যাবেই না, শত্রুতার মনোভাবও পোষণ করা যাবে না। তার কারণ, আল্লাহ্‌র প্রিয় ভাজন লোকদের সাথে শত্রুতা করা মানে হলো আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া।

✪ আল্লাহ্‌র প্রিয় ভাজন হতে হলে নেক্‌কার, সৎ আ'মলকারী সৎকর্মশীল হতে হবে। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সকল কাজ আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে এবং সকল হারাম নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। তাই তা ব্যক্তিগত হোক, পরিবারক হোক, সামাজিক হোক অথবা রাজনৈতিক হোক প্রতিটি কাজের মধ্যে সততার পরিচয় দিতে হবে। মিথ্যাচারিতা, ধোকাবাজি এবং প্রতারণার সকল পথকে বর্জন করতে হবে।

✪ তাক্‌ওয়াবান বা খোদাভীরু হতে হবে। সকল কাজে এবং সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে রাখতে হবে। আল্লাহ্‌র ভয় এবং ভক্তিতে মন-দেলকে পরিপূর্ণ করতে হবে।

✪ লোক দেখানো কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ অনেক সৎ কাজ আছে যা মানুষের অগোচরে করা সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে মানুসিকতা এই থাকতে

হবে যে, মানুষ দেখলে দেখুক এতে কোনো পরওয়া নেই তবে এই কাজটা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই হতে হবে। বেশী বেশী আল্লাহ্‌র দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর যেসব কাজ গোপনে করা যায় তা বেশী বেশী করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে রিয়া থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

✪ এমন নিরহংকারী, সৎ আ'মলধারী হতে হবে। যাতে মানুষের অগোচরে বা চক্ষুর আড়ালে চলে যায় তবুও যেন মানুষ তাকে অন্তরে স্থান করে। মানুষের স্মৃতি থেকে বিলীন হয়ে না যায়। মানুষের মনের মধ্যে স্থান করে নেয়। আর মনের মানুষ তখনই হওয়া যায়, যখন কাজের মধ্যে কোনো রিয়া থাকে না। অহংকার এবং দাম্ভিকতা থাকে না। মানুষের সামনে আ'মলের প্রচার এবং বড়াই করে না।

✪ মানুষ বা সমাজের মধ্য থেকেই সৎ কাজ করতে হবে। তবে নীরব ভাবে কাজ করে যেতে হবে। কাজের থেকে কাজের বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রপাগান্ডা বেশী হবে না। ফোকাসিং কাজের প্রতি বেশী আগ্রহী হওয়া যাবে না। এমন নীরব ভাবে দ্বীনের কাজ করে যেতে হবে যা আল্লাহ্‌র কাছে অতি প্রিয় হবে কিন্তু মানুষের কাছে বেশী পরিচিত হবে না। বরং মানুষের মধ্যে অপরিচিত থেকে যাবে। খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করার জন্য চেষ্টা করবে না।

✪ অন্তরকে এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যা মশালের মতো মানুষকে সঠিক পথ বাতলিয়ে দেবে। মানুষের অন্তর তখনই মশালস্বরূপ আলোকবর্তিকা হবে যখন তার অন্তর নিরাহংকারী এবং স্বার্থ মুক্ত হবে।

✪ সামাজিক খ্যাতি অর্জন এবং রিয়া বা লোক দেখানো কাজ থেকে বাঁচার জন্য মাঝে মাঝে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জন স্থানে চলে যেতে হবে। মন বা অন্তরকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করতে হবে। তবে সমাজচ্যুত বৈরাগী হওয়া যাবে না। বরং রিয়ার মতো বড় অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে এই পথ অবলম্বন করতে হবে।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হলো এতে যদি আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর হাদীস থেকে যেসব মূল্যবান শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন আমরা বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি। মাআসসালাম।

আট

আল্লাহ পাকের মহত্ব

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَنْ اَبِیْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا
رَوٰی عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی اَنَّهٗ قَالَ، يَا عِبَادِیْ! اِنِّیْ
حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰی نَفْسِیْ وَجَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا
تَظَالَمُوْا يَاعِبَادِیْ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهٗ،
فَاسْتَهْدُوْنِیْ اَهْدِكُمْ؛ يَا عِبَادِیْ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلَّا مَنْ
اَطْعَمْتُهٗ، فَاسْتَطْعِمُوْنِیْ اَطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِیْ! كُلُّكُمْ عَارٍ
اِلَّا مَنْ كَسَوْتُهٗ فَاسْتَكْسُوْنِیْ اَكْسُكُمْ يَاعِبَادِیْ! اِنَّكُمْ
تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا.
فَاسْتَغْفِرُوْنِیْ اَغْفِرْلَكُمْ. يَا عِبَادِیْ! اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا
ضَرِّیْ فَتَضُرُّوْنِیْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِیْ فَتَنْفَعُوْنِیْ. يَا
عِبَادِیْ! لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ - كَانُوْا
عَلٰی اَتْقٰی قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَازَادَ ذٰلِكَ فِیْ
مُلْكِیْ شَيْئًا، يَاعِبَادِیْ! لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ
وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰی اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ.مَا نَقَصَ
ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِیْ شَيْئًا. يَا عِبَادِیْ ! لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ

وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَسَأَلُوْنِىْ، فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِىْ اِلَّاكَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ- يَا عِبَادِىْ! اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ- ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا- فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ- وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু যর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এবং তিনি বরকতময় মহান আল্লাহ তা'আলা হতে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! আমি যুলুম করাকে আমার উপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের জন্যেও তা হারাম করে দিয়েছি। কাজেই তোমরা একে অপরের প্রতি যুলুম করো না।

হে আমার বান্দারা! আমি যাদেরকে হেদায়াত করেছি, তারা ছাড়া তোমরা সবাই বিপথগামী। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হেদায়াত চাও, আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করবো।

হে আমার বান্দারা! আমি যাদেরকে খাবার দিয়েছি, তারা ছাড়া তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। সুতরাং আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব।

হে আমার বান্দারা! আমি যাদেরকে বস্ত্র দিয়েছি, তারা ছাড়া তোমরা সবাই বস্ত্রহীন। সুতরাং আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করবো।

হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন পাপে লিপ্ত। আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব।

হে আমার বান্দারা! আমার কোনো ক্ষতি করার সাধ্য তোমাদের নেই। আমার কোনো উপকার করার সামর্থও তোমাদের নেই।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে মুত্তাকী ব্যক্তির ন্যায় আল্লাহভীরু হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাতেও আমার সাম্রাজ্যের মর্যাদা বিন্দুমাত্রও বৃদ্ধি পাবে না।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে পাপিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় পাপিষ্ট হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাতেও আমার সাম্রাজ্যের কোনো প্রকার ঘাটতি হবে না।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জিন যদি কোথাও একত্র হয়ে আমার কাছে চায়, আর আমি তাদের প্রত্যেকের চাহিদা অনুযায়ী দান করি, তবে আমার ভান্ডার থেকে কেবল ততটুকুই কমবে, যতটুকু একটি সূচ সাগরে ডুবিয়ে তুললে সাগরের পানি কমবে।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের আ'মলসমূহ আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখি। অতঃপর তোমাদের তার পূর্ণ বিনিময় দান করবো। সুতরাং যে কল্যাণ লাভ করবে, সে যেন আল্লাহর শোকর আদায় করে। আর যে অন্য কিছু পাবে, সে যেন এজন্য নিজেই তিরস্কার করে। (মুসলিম শরীফ)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ -থেকে বা হতে। فِيْمَا-অতঃপর উহা হতে। -رَوٰى -বর্ণনা। يَا -হে বা ওহে। عِبَادِىْ -আমার বান্দারা। اِنِّى-নিশ্চয় আমি। حَرَّمْتُ -হারাম করে নিয়েছি। اَلظُّلْمُ।-যুলুম, অত্যাচার। عَلٰى--উপর। نَفْسِىْ -আমার জীবন। وَجَعَلْتُهٗ-এবং উহা করে দিয়েছি। بينكم-- -তোমাদের পরস্পরের মধ্যে। فَلَا تَظَالَمُوْا-অতএব তোমরা যুলুম করো না। كُلُّكُمْ -তোমাদের প্রত্যেকে। ضَالٌّ -বিপথগামী। اِلَّا-ছাড়া, ব্যতীত। مَنْ -যে বা যাকে। هَدَيْتُهٗ-আমি তাদের (যাদের) হেদায়েত

করেছি। فَاسْتَهْدُوْنِىْ -অতএব আমার কাছে হেদায়াত চাও। اِهْدِكُمْ-আমি তোমাদের হেদায়াত দান করবো। جَائِعٌ -ভুখা বা ক্ষুধার্ত। -اَطْعَمْتُهُ-আমি তাদের (যাদের) খাবার দিয়েছি। فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ -অতএব আমার কাছে খাবার চাও। اَطْعِمْكُمْ -আমি তোমাদের খাবার দেব। عَارٍ -বস্ত্রহীন, ল্যাংটা। كسوته -আমি তাদের (যাদের) পোশাক দিয়েছি-فَاسْتَكْسُوْنِىْ অতএব আমার কাছে পোশাক চাও। اَكْسُكُمْ -আমি তোমাদের পোশাক দেব। اِنَّكُمْ-নিশ্চয় তোমরা। تُخْطِئُوْنَ-তোমরা পাপে লিপ্ত। بِا-সহিত বা সাথে। اَلَيْلِ -রাত। وَ -এবং اَلنَّهَارِ -দিন। اَنَا-আমি। اَغْفِرُ-ক্ষমা করি। اَلذُّنُوْبَ -পাপসমূহ। جَمِيْعًا-সমস্ত। فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ-অতএব আমার কাছে ক্ষমা চাও। اَغْفِرْلَكُمْ-আমি তোমাদের ক্ষমা করবো।

لَنْ تَبْلُغُوْا- -তোমাদের সাধ্য নেই। ضَرِّىْ -আমার ক্ষতি করার। نَفْعِىْ- আমার উপকার। لَوْ-যদি। اَوَّلَكُمْ তোমাদের পূর্বের। اٰخِرَكُمْ -তোমাদের পরের। اِنْسَكُمْ -তোমাদের সব মানুষ। وَ جِنَّكُمْ -এবং তোমাদের সব জিন। كَانُوْا -হয়ে যায়। على-উপর। اتقى -আল্লাহ্ ভীরু। قَلْبِ -অন্তর। رَجُلٍ -ব্যক্তি। وَاحِدٍ- -এক। مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যেকার। مَازَادَ -বৃদ্ধি পাবে না বা করবে না। فِى مُلْكِىْ -আমার সাম-রাজ্যের মধ্যে। شَيْئًا -কোনো কিছু। اَفْجَرِ-পাপিষ্ঠ। مَا نَقَصَ -ক্ষতি বা ঘাটতি হবে না। قَامُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ -কোনো এক যায়গায় একত্রিত হয়। فَسَأَلُوْنِىْ- -অতপর আমার কাছে চায়। فَاَعْطَيْتُ

–অতপর আমি তাদের দেই বা দান করি। كُلَّ اِنْسَانٍ –প্রত্যেক মানুষের। مَسْأَلَتَهُ- –তাদের চাহিদা মতো। مَا نَقَصَ–ক্ষতি বা ঘাটতি হবে না। عِنْدِىْ –আমার কাছ থেকে। اِلَّا–ছাড়া বা ব্যতীত। كَمَا يَنْقُصُ –ততোটুকু কমবে। الْمَخْيَطُ –সূচ। اِذَا–যখন। الْبَحْرَ–أَدْخِلَ–সমুদ্রে প্রবেশ করায়। أَعْمَالُكُمْ –তোমাদের কার্যক্রম। أُحْصِيْهَا –আমি সংরক্ষণ করে রাখি। لَكُمْ –তোমাদের জন্য। ثُمَّ–অতঃপর। أُوَفِّيْكُمْ- –তোমাদের তার বিনিময় দান করবো। اِيَّاهَا –তার পূর্ণরূপে। فَمَنْ وَجَدَ –অতএব যে লাভ করবে বা পাবে। خَيْرًا–কল্যাণ। فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ- –অতঃপর সে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে বা শুকরিয়া আদায় করে। غَيْرَ ذٰلِكَ –অন্যকিছু পাবে। فَلَا يَلُوْمَنَّ–অতঃপর সে তিরস্কার করে না اِلَّا نَفْسَهُ নিজেকে ছাড়া।

সম্বোধন ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আমি আপনাদের সামনে দারসে হাদীস পেশ করার জন্য বিশিষ্ট সাহাবী ও রাবী হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসটা পাঠ ও অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে হাদীসটার সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তাওফীক দান করেন।

রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ রাবী হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঁচ নম্বর হাদীসে দেখুন।

হাদীসটা বর্ণনার সময়কাল ঃ হাদীসটা বর্ণনার সময়কাল সম্পর্কে আমাদের কাছে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। তার পরও হাদীসটার বিষয়বস্তু দেখে অনুমান করা যায় যে, হাদীসটা সম্ভবতঃ মহানবী (সাঃ) মাক্কী জিন্দেগীতে বর্ণনা করেছিলেন। কেননা হাদীসে আল্লাহ্র মহত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাক্কী জীবনে বেশী বেশী গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করতেন। আল কুরআনের আয়াত এবং সূরা গুলোও আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং মহত্ব সম্পর্কে মাক্কী জীবনে নাযিল হয়। এছাড়া রাবী আবু যর গিফারী (রাঃ)ও

ইসলাম কবুলকারী সাহাবীদের মধ্যে প্রথম দিকের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তারপরও আল্লাহ্ পাকই বেশী ভাল জানেন।

হাদীসটা গ্রহণকারী কেতাবের পরিচয় ঃ হাদীসের মুহাদ্দীস ইমাম মুসলিম (রঃ) এর সংকলিত কিতাব 'মুসলিম শরীফ' সিহাহ্ সিত্তাহ বা বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত। বুখারী শরীফের পরই এই কিতাবের স্থান। কোনো কোনো মুহাদ্দীস মুসলিম শরীফকে কিছু কিছু বৈশিষ্টের কারণে বুখারীর উপরও স্থান দিয়েছেন। সহীহ্ হাদীসের অধিকাংশ হাদীস বুখারী এবং মুসলিম উভয়ে তাদের আপন আপন কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। আর যেই হাদীসের ব্যাপারে তারা উভয়ে একমত হয়েছেন, হাদীসের পরিভাষায় তাকে "মুত্তাফাকুন আলাইহ্" বলা হয়। বর্ণিত হাদীসটা ইমাম মুসলিম (রঃ) এককভাবে তাঁর কিতাব মুসলিম শরীফে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ধরে নেয়া যায় হাদীসটা সহীহ্ বিশুদ্ধ।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটার প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য প্রদান করা হলো। এখন নিম্নে হাদীসটার ব্যাখ্যা পেশ করছি ঃ

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيْمَا رَوٰى عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى

হযরত আবু যর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে এবং তিনি বরকতময় মহান আল্লাহ্ তাআ'লা হতে বর্ণনা করেছেন।

রাবীর উপরোক্ত বর্ণনার বাচনভঙ্গী থেকে বুঝা যায়, হাদীসটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর কথা তাঁর যবান দিয়ে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের পরিভাষায় একে হাদীসে কুদুসী বলা হয়। কেননা হাদীসের পরবর্তী বাক্য اَنَّهُ قَالَ 'তিনি (আল্লাহ্) বলেন', বলে হাদীসের মূল এবারত বা মূল বক্তব্যে আল্লাহ্ তাবারাকওয়া তাআ'লার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী বাক্যগুলো দ্বারা আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর নিজের মহত্ব বড়ত্ব এবং অসীম ক্ষমতার কথা বলেছেন। অত্র হাদীসে আল্লাহ্ তাআ'লা প্রায় দশবার তাঁর বান্দাদের ডেকে ডেকে তাদেরকে কিছু নির্দেশ এবং তাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং নিজের মহত্ব ও

বড়ত্বের কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্পাক তাঁর মহত্বের কথা বান্দাদের সম্বোধন করে বলেন ঃ

প্রথম মহত্ব ঃ

يَا عِبَادِىْ ! اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا

হে আমার বান্দারা! আমি যুলুম করাকে আমার উপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের জন্যও তা হারাম করে দিয়েছি। কাজেই তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না।

হাদীসের এই প্রথম মহত্বে এবং নির্দেশে আল্লাহ্ পাক যূলুম অত্যাচার করাকে তিনি নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর কোনো বান্দার প্রতি যূলুম করেন না। যূলুম করাকে তিনি পছন্দ করেন না। যূলুম মানেই হলো বান্দার যা হক বা প্রাপ্য তা না দেয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ কোনো বান্দাহ্কে দুনিয়া এবং আখেরাতে সুখ-শান্তি দিয়ে থাকেন তা তাদের আ'মলের প্রাপ্য অনুযায়ীই দিয়ে থাকেন। আর যাদের তিনি দুনিয়ায় গযব-আযাব এবং আখেরাতে শাস্তি দিয়ে থাকেন তাও তাদের আ'মলের প্রতিফল হিসেবেই দিয়ে থাকেন। সুতরাং তিনি যদি ভাল কল্যাণকর এবং সৎ কাজের প্রাপ্য হিসেবে প্রতিদান না দেন এবং অন্যায়, অকল্যাণকর এবং অসৎ কাজের প্রতিফল হিসেবে শাস্তি না দেন তাহলেই তা হবে বান্দার উপর যুলুম। কেননা আল্লাহ্ দুনিয়াতে প্রতিফল হিসেবে তাদেরকে যে শাস্তি দেন তা বান্দাদের নিজ হাতে অর্জিত ফল। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ **জ্বলে ও স্থলে যেসব বিপর্যয় তা মানুষেরই কর্মের ফল।** (সূরা রূম-৪০) অতএব তিনি যেসব আযাব-গযব এবং শাস্তি দেন এটা তার পক্ষ থেকে যুলুম নয়। বরং তিনি তো বান্দার অসংখ্য অপরাধ তার দয়ার কারণে প্রতিনিয়ত ক্ষমা করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ যেহেতু তাঁর বান্দাহদের প্রতি সামান্যতমও যুলুম করেন না, ফলে তিনি তাঁর বান্দাদেরকেও ডেকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরাও একে অপরের প্রতি যূলুম করবে না। যুলুমকে প্রশ্রয় দেবে না।

কেননা আমার মতো তোমাদের উপরও যুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছি যারা যুলুম করে তাদেরকে যালেম বা অত্যাচারী বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অন্য এক হাদীসে যালেম এবং মাযলুম উভয়কে সাহায্যের কথা বলে বলেন ঃ

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا اِنْ يَّكُ ظَالِمًا فَارْدُدْهُ مِنْ ظُلْمِهٖ وَاِنْ يَّكُ مَظْلُوْمًا فَا نْصُرْهُ-

তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইকে সাহায্য করো (চাই) সে যালেম(অত্যাচারী) হোক অথবা মাযলুম (অত্যাচারিত) হোক। যদি সে যালেম হয় তাহলে তার যুলুমের হাতকে চেপে ধরো আর যদি সে মাযলুম হয় তাহলে তাকে সাহায্য করো। (দারেমী)। সুতরাং বান্দাহর উচিত হবে একে অপরের প্রতি যুলুম না করা। বরং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া।

দ্বিতীয় মহত্ব ঃ

يَا عِبَادِىْ ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهٗ، فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ

হে আমার বান্দারা! আমি যাদেরকে হেদায়াত দান করেছি, তারা ছাড়া তোমরা সবাই বিপথগামী। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হেদায়াত চাও, আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করবো।

আল্লাহ্ তাআ'লা দ্বিতীয় মহত্বে তাঁর বান্দাদের ডেকে বলছেন, তোমরা ছিলে সবাই বিপথগামী-বিভ্রান্ত। আমি দয়া করে তোমাদের মধ্যে যাদেরকে হেদায়াত তথা সঠিক পথ দেখিয়েছি কেবলমাত্র তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছো। কেবলমাত্র তারাই সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে জান্নাতে যাবার সুযোগ লাভ করেছো। সুতরাং এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক বড় দয়া এবং মেহেরবাণী। যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে হেতায়াতের এই সঠিক পথ না দেখাতেন তাহলে তোমরা সবাই বিপদগামী হয়ে দুনিয়া এবং আখেরাতে ধ্বংস হয়ে জাহান্নামে চলে যেতে। অতএব তোমাদের উচিত বিপথগামী জাহান্নামের পথ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র কাছে হেদায়াতের পথ লাভের জন্য ফরিয়াদ করা। চেষ্টা ফিকির করা। তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমাদের এই দোআ এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কবুল করে জাহান্নামের সেই বিভ্রান্তির পথ থেকে উদ্ধার করে

হেদায়াত দান করে জান্নাতের সঠিক পথ বাতলিয়ে দেবেন।

হাদীসের এই বক্তব্যে বুঝা যায়, মানুষ শুধু চেষ্টা বা নিজের আ'মল দ্বারাই হেদায়াত লাভ করে না। বরং সেখানে আল্লাহ্‌র সাহায্য অবধারিত। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কেউ হেদায়াত লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দান করেন কেবলমাত্র সেই হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। সুতরাং হেদায়াত লাভের মাধ্যম হলো নিজে চেষ্টা করা এবং সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কাছে হেদায়াত লাভের জন্যে সাহায্য চাওয়া। এ দু'টোর সমন্বয় হলেই কেবলমাত্র আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের হেদায়াত দান করবেন।

আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া যেমন শুধু চেষ্টার মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করা যায় না। তেমনি চেষ্টা না করেই শুধু আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপর ভরসা করেও হেদায়াত লাভ করা যায় না। কেননা আল্লাহ্ পাক কোনো অলস, অকর্মন্য ব্যক্তিকে সঠিক পথ দেখান না। হাদীসে হেদায়াত চাওয়া শব্দের মধ্যে নিজের চেষ্টা ও আল্লাহর সাহায্য দু'টোই রয়েছে।

তৃতীয় মহত্ব ঃ

يَا عِبَادِىْ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اَطْعِمْكُمْ-

হে আমার বান্দারা! আমি যাদেরকে খাদ্য-খাবার দিয়েছি তারা ছাড়া তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। সুতরাং আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদের খাবার দেব।

হাদীসের এই অংশে আল্লাহ্‌র যে মহত্ব তা হলো দুনিয়ার সকল মানুষই ক্ষুধার্ত, ভুখা। কেবলমাত্র তারা নয় যাদেরকে আল্লাহ্ তাআ'লা খাদ্য-খাবার দিয়েছেন। মানুষ যা খাদ্য-খাবার খাচ্ছে তা আল্লাহ্‌র বিশেষ মেহেরবাণীর ফল। আল্লাহ্ যদি দয়া করে তাঁর বান্দাদের ক্ষুধা নিবারনের ব্যবস্থা না করতেন তাহলে কোন মানুষের ক্ষমতা নেই যে, সে নিজের চেষ্টায় ক্ষুধা থেকে বাঁচতে পারে। তাই আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর বান্দাদের আহবান করে বলছেন, তোমরা আমার কাছে খাবার চাও আমি তোমাদের খাবার দেব।

এখানে খাদ্য-খাবারের জন্য 'প্রার্থনা করো' বলে এই বাক্যের মধ্যেও চেষ্টা এবং

আল্লাহ্‌র সাহায্য দু'টো অর্থই রয়েছে। নিজের রুজি বা খাদ্য খাবারের জন্য নিজে যেমন চেষ্টা করবে তেমনি আল্লাহ্‌র সাহায্যও কামনা করবে। নিজের চেষ্টা বাদ দিয়ে যেমন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপর নির্ভর করা যাবে না। তেমনি আল্লাহ্‌র সাহায্য বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নিজের চেষ্টার উপরও নির্ভর করা যাবে না।

সুতরাং আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে তাদেরকেই ক্ষুধা নিবারনের জন্য খাদ্য-খাবার দেবেন যারা নিজে আপ্রাণ চেষ্টা করবে, বুদ্ধি কৌশল খাটাবে এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যের জন্য ধর্ণাও দেবে।

চতুর্থ মহত্ব ঃ

يَا عِبَادِىْ! كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّمَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ-

হে আমার বান্দারা! আমি যাদেরকে বস্ত্র দিয়েছি, তারা ছাড়া তোমরা সবাই বস্ত্রহীন। সুতরাং আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করবো।

প্রকৃতপক্ষে মানুষতো জন্মলাভ করেছে বস্ত্রহীন ল্যাংটা অবস্থায়। আবার তাদের সকলকে বিচারের দিন হাশরের ময়দানে দাঁড় করানো হবে বস্ত্রহীন ল্যাংটা অবস্থায়। মাঝ পথে দুনিয়ার এই জীবনে মানুষকে তার লজ্জা নিবারন, গরম ও ঠান্ডা থেকে বাঁচা এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্ পাক মেহেরবাণী করে পোষাকের ব্যবস্থা করেছেন। তাই হাদীসের এই অংশে আল্লাহ্ পাক বলেছেন তোমরা সবাই বস্ত্রহীন ছিলে, আমি দয়া করে তোমাদেরকে পোষাকের ব্যবস্থা করে ল্যাংটা থেকে মুক্ত করেছি। তোমাদের ল্যাংটা থেকে বাঁচার জন্য তোমাদের কোনো ক্ষমতা ছিলো না। আমিই তোমাদেরকে মেহেরবাণী করে বস্ত্র দেবার ব্যবস্থা করেছি। অর্থাৎ আমি তোমাদের জীবিকা দান করেছি সেই জীবিকা থেকেই তোমরা বস্ত্র ক্রয় করে তোমাদের লজ্জা নিবারন করেছো।

সুতরাং তোমরা তোমাদের ইজ্জত আব্রু রক্ষা করার জন্য কেবল আমার কাছেই পোষাক চাও, আমি তোমাদের আবেদন কবুল করবো এবং তোমাদের পোষাকের ব্যবস্থা করবো। লজ্জা নিবারনের জন্য পোষাক পেতে হলে

কেবলমাত্র তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব নয়। আমার সাহায্য সহযোগীতার প্রয়োজন রয়েছে। আমার সাহায্য এবং দয়া ছাড়া তোমাদের পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। সুতরাং কেবলমাত্র আমার কাছেই চাও, অন্য কারো কাছে নয়।

পঞ্চম মহত্ব ঃ

يَا عِبَادِىْ! اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا- فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْ لَكُمْ-

হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন পাপে লিপ্ত। আমিই সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব।

হাদীসে মহান আল্লাহ্র পঞ্চম মহত্ব এই যে, আল্লাহ্ বড়ই মেহেরবান, পাপ মোচনকারী। আমরা আল্লাহ্র এই নিয়া'মতে ভরা দুনিয়ার নিয়া'মত ভোগ ব্যবহার করে তারই অবাধ্য হয়ে পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে আছি। আমরা জান্তে–অজান্তে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে শয়তানের ধোকায় অসংখ্য পাপ করে যাচ্ছি। আল্লাহ্ যদি غَفُوْرُ الرَّحِيْم ক্ষমাশীল, মেহেরবান না হতেন, তা হলে আমরা আমাদের পাপের দরিয়ায় হাবুডুবু খেয়ে আল্লাহ্র অভিশপ্ত বান্দা হিসেবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতাম। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের অসংখ্য অপরাধকে উপেক্ষা করে প্রতিনিয়ত ক্ষমা করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে আমাদের পাপের জন্য পাকড়াও করতে চাইতেন তাহলে কেউ আমরা তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পেতাম না। সুতরাং আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ডেকে বলছেন তোমরা তোমাদের অর্জিত পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য কেবলমাত্র আমার কাছেই ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব।

আল্লাহ্ এতো উদার, দাতা এবং মেহেরবান যে, বান্দা যদি একবার আল্লাহ্র কাছে স্যালেন্ডার করে ক্ষমা চায়, তাহলে আল্লাহ্ সব কিছু ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। সুতরাং আমাদের যেমন শয়তানের অসঅয়াসার ব্যাপারে সজাগ- সতর্ক থেকে পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে, তেমনি আমাদের হয়ে যাওয়া পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ তাআ'লার কাছেই ক্ষমা চাইতে হবে।

ষষ্ঠ মহত্ব ঃ

يَا عِبَادِىْ! اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْ اضَرِّىْ فَتَضُرُّوْنِىْ- وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِىْ فَتَنْفَعُوْنِىْ-

হে আমার বান্দারা! আমার কোনো ক্ষতি করার সাধ্য তোমাদের নেই। আমার কোনে উপকার করার সামর্থও তোমাদের নেই।

এখানে আল্লাহ্র মহত্বের কথা হলো এই যে, আল্লাহ্ এমন এক মহান ক্ষমতাধর সত্ত্বা যে মানুষ যদি সবাই মিলে আল্লাহ্র ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তাঁর একচুল পরিমাণও ক্ষতি করতে পারবে না। বরং ক্ষতি যা হবে তা মানুষেরই হবে। আবার যদি মানুষ আল্লাহ্র উপকার করতে চায়, তাও মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই যে আল্লাহ্র কোনো উপকার করতে পারে। বরং উপকার যা হবে তা মানুষেরই হবে। লাভ-ক্ষতি মানুষেরই, আল্লাহ্র কোনো লাভও নেই ক্ষতিও নেই।

পৃথিবীর সব মানুষ যদি আল্লাহ্র এবাদত-বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তাতে আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি নেই। আবার যদি দুনিয়ার সব মানুষ আল্লাহ্র এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয়ে নেক্কার হয়ে যায়, তাতেও আল্লাহ্র কোনো উপকার নেই। এবাদত-বন্দেগী করলে এবং পাপাচার থেকে দূরে থেকে নেক্কার হয়ে গেলে বান্দার নিজের লাভ। অপরপক্ষে আল্লাহ্র এবাদত-বন্দেগী ত্যাগ করে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে গেলে বান্দারই ক্ষতি। সুতরাং আল্লাহ্র বান্দাদের উচিত নিজের ক্ষতি থেকে বেঁচে নিজেরই মহা উপকারের জন্য বেশী বেশী আল্লাহ্র এবাদত-বন্দেগী করা আর তাঁরই নির্দেশ মতো জীবন পরিচালনা করা এবং তার মধ্যেও যে পাপ হয়ে যায় তা ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করা ।

সপ্তম মহত্ব ঃ

يَا عِبَادِىْ ! لَوْاَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا

عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ۔مَازَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا.

হে আমার বান্দারা! তোমাদের আগের ও পরের সব মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যকার সব চেয়ে মুত্তাকী ব্যক্তির ন্যায় আল্লাহ্ ভীরু হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাতে আমার সাম্রাজ্যের মর্যাদা বিন্দুমাত্রও বৃদ্ধি পাবে না।

হাদীসের সপ্তম মহত্বে আল্লাহ্ পাক নিজেই বলেন, পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যতো মানুষ ও জিন পৃথিবীতে আসবে তারা যদি সবাই মুত্তাকী, খোদাভীরু হয়ে যায়। তাদের অন্তর যদি আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে প্রকম্পিত হয়ে যায়। তাদের অন্তর যদি আল্লাহ্র ভয় ও ভক্তিতে ভরপুর হয়ে যায়। অর্থাৎ গোটা জাহানের মানুষ ও জীন যদি প্রকৃত আল্লাহ্ ভীরু হয়ে মুত্তাকী হয়ে যায়, তাতে আল্লাহ্র এই বিশাল সাম্রাজ্যের সামান্যতমও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। বরং মর্যাদা যদি কিছু বৃদ্ধি পায় তবে যারা মুত্তাকী তাদেরই পাবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সূরা হুজুরাতে বলেন ঃ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ **নিশ্চয়ই আমার কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশী মর্যাদাশীল যে আ-মাকে ভয় করে।**

সুতরাং এই আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্কে ভয় করলে যে ভয় করে তারই মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্র কাছে সেই বেশী মর্যাদা লাভ করে থাকে। এতে আল্লাহ্ বা আল্লাহ্র সাম্রাজ্যের একচুল পরিমাণও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না।

অতএব আল্লাহ্র কাছে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্কে হৃদয় দিয়ে প্রেমমাখা ভয় ও ভক্তি করা উচিত।

অষ্টম মহত্ব ঃ

يَا عِبَادِىْ! لَوْاَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ۔مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ شَيْئًا

হে আমার বান্দারা! তোমাদের আগের ও পরের সব মানুষ ও জিনও যদি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে পাপিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় পাপিষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী যায়, তাতেও আমার সাম্রাজ্যের কোনো প্রকার ঘাটতি হবে না।

হাদীসের এই অংশে মহান আল্লাহ্‌র মহত্ব বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্‌ নিজেই বলেন, হে আমার বান্দারা পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ ও জিন যদি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পাপিষ্ঠ হয়ে যায়। আর পাপিষ্ঠ লোকদের মতো সবার অন্তর যদি পাপিষ্ঠ হয়ে যায় এবং তাদের হৃদয় যদি পাপে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তবুও তোমাদের পাপাচার ও পাপিষ্ট হৃদয়ের কারণে আমার সাম্রাজ্যের একচুল পরিমাণও ক্ষতি হবে না। আমার এই সাম্রাজ্যের সামান্যতমও মর্যাদা হানি হবে না। বরং তোমাদের এই পাপাচার এবং পাপিষ্ট হৃদয়ের কারণে তোমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমাদের নিজেদেরই মর্যাদাহানি হবে। তোমাদের এই পাপাচারের কারণে দুনিয়ায় যেমন তোমরা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করবে, তেমনি পরকালেও তোমাদেরকে নিকৃষ্টভাবে কঠিন শাস্তির জায়গা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং তোমাদের এই পাপাচার এবং পাপিষ্ট হৃদয়ের কারণে নিজেরা নিজেদেরই লাঞ্ছিত করে মহা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র এই বিশাল সাম্রাজ্যের কোনো ক্ষতি হবে না। অতএব আমাদেরকে সেই মহা ক্ষতি এবং লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্য পাপাচার বা পাপের কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং পাপাচার থেকে মুক্ত থাকার জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

নবম মহত্ব ঃ

يَا عِبَادِيْ! لَوْاَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَاَلُوْنِيْ- فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْاَلَتَهُ- مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ-

হে আমার বান্দারা! তোমাদের আগের ও পরের সব মানুষ ও জিন যদি কোথাও জমায়েত হয়ে আমার কাছে চায়, আর আমি যদি তাদের প্রত্যেকের চাহিদা অনুযায়ী দান করি, তবে আমার ভান্ডার কেবল ততটুকুই কমবে, যতটুকু একটা সূচ সাগরে ডুবিয়ে তুললে সাগরের পানি কমবে।

হাদীসের এই বক্তব্যে আল্লাহ্‌র মহত্ব এবং তাঁর ভান্ডার যে বিশাল, অফুরন্ত তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। হাদীসের এই অংশে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ তোমাদের আগের ও পরের অর্থাৎ আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যতো মানুষ এবং জিন আসবে তারা সবাই যদি আমার পৃথিবীর কোনো এক স্থানে জমায়েত হয়ে যার যা ইচ্ছা বা বাসনা পূরণের জন্য আমার কাছে চায়, আর আমি তাদের আপন আপন চাহিদা মতো যদি তাদের প্রত্যেকের চাহিদা বা ইচ্ছা পূর্ণ করে দেই, তাহলে আমার ভান্ডার এতো বড় এতো বিশাল যে, সেই ভান্ডারের কোনো কমতি-ঘাটতি হবে না। যদিও কোনো কমতি হয়, তবে তা টেরও পাওয়া যাবে না। আমার ভান্ডার এমনই যে, বিশাল সমুদ্রের পানিতে যদি একটা সূচ ডুবানো হয়, আর সেই সূচের মাথায় পানি উঠে, সেই পানি যেমন সমুদ্রের পানি বিন্দুমাত্র কমাতে পারে না, কিছুমাত্র কমলেও কোনো টের পাওয়া যায় না। অনুরূপ আমার ভান্ডার। আমার এই ভান্ডার থেকে শুধু মানুষ ও জিন কেন, আমার সমস্ত মাখলুকাতেরও যদি চাহিদা পূর্ণ করি তাতেও আমার ভান্ডারের কোনো কমতি হবে না, ঘাটতি হবে না। সুবহান আল্লাহ্!! আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহু আকবার।

আল্লাহ্‌র পবিত্রতা, আল্লাহ্‌র মহত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করে শেষ করা যায় না।

দশম মহত্ব ঃ

يَا عِبَادِىْ! اِنَّمَاهِىَ اَعْمَا لُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا- فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْ مَنَّ اِلاَّنَفْسَهُ-

হে আমার বান্দারা! তোমাদের আ'মল সমূহ আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখি। অতঃপর তোমাদের তার পূর্ণ বিনিময় দান করবো। সুতরাং যে কল্যাণ লাভ করবে, সে যেন আমার শোকর আদায় করে। আর যে অন্য কিছু পাবে সে যেন এজন্য নিজেকেই তিরস্কার করে।

হাদীসে কুদসীর এই হাদীসে দশম ও সর্বশেষ আল্লাহ্‌র মহত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআ'লা মানুষের প্রতিটি আ'মল বা কার্যক্রমকে ছোট হোক আর বড় হোক, প্রকাশ্য হোক আর গোপনেই হোক,

সকল আ'মল বা কার্যক্রমকে বিশেষ ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করে থাকেন। যে সংরক্ষণে সামান্যতমও ত্রুটি থাকে না। মানুষের যার যে আ'মল তা কমতি বৃদ্ধি না করে ঠিক ঠিক ভাবে সংরক্ষণ করেন।

আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর বান্দাদের আ'মল সংরক্ষণ করার জন্য একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। যাতে কোনো বান্দা আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআ'লাকে সামান্যতমও দোষারোপ করতে না পারে। আর বান্দার সেই সংরক্ষিত আ'মলনামা বিচারের দিন হাশরের ময়দানে বান্দার সামনে তাদের নিজ নিজ আম'লনামা হাজির করা হবে। আর তাদের সেই আ'মলনামা বা কার্যক্রমের পূর্ণ বিনিময় বা প্রতিদানও দেয়া হবে। কোনো প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে না।

আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তাআ'লা তাঁর বান্দাদের এ ব্যাপারে ওয়াজ করে বলেন, তোমাদের অর্জিত আ'মলনামার জন্য যদি কেউ উপকার বা কল্যাণ লাভ করে অর্থাৎ দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখেরাতে জান্নাত লাভ করে, সে যেন সেই জন্য আল্লাহ্রই প্রশংসা করে, আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। কেননা সে যেসব কল্যাণকর নেক আ'মল করতে পেরেছে তা একমাত্র আল্লাহ্রই মেহেরবানীতে করেছে। এতে তার কোনো নিজের ক্রেডিট নেই। যদি আল্লাহ্ তাকে সাহায্য না করতেন তাহলে তার জন্য ভাল, নেক এবং কল্যাণকর আ'মল করা সম্ভব হতো না। সুতরাং ধন্যবাদ পাবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তাআলারই।

অপর পক্ষে যদি তার দুনিয়ার আ'মল বা কার্যক্রমের দ্বারা কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু পায় অর্থাৎ দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পাপে পূর্ণ হয়ে পরকালে জাহান্নামী হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তার জন্য সে যেন আল্লাহ্কে দোষারোপ না করে, আল্লাহ্কে অভিষাপ না দেয়। বরং এই অন্যায় আ'মলের জন্য যেন সে নিজে নিজেকেই দোষারোপ করে, নিজেকেই তিরস্কার করে। কেননা দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআ'লা বান্দার জন্য অসংখ্য নেয়া'মত দান করেছেন এবং বান্দাকে স্বাধীনতাও দান করেছেন, এবং ভাল মন্দ বিচারের জন্য বিবেচনা শক্তিও দিয়েছেন। ভাল কাজের প্রতিদান এবং মন্দ কাজের প্রতিফলের কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। তার পরেও যদি কেউ দুনিয়ার মোহে ডুবে গিয়ে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে, আল্লাহ্র দেয়া স্বাধীনতাকে বিপথে পরিচালিত করে, সত্য ও ন্যায়ের পথকে ত্যাগ করে অসত্য ও অন্যায়ের পথকেই বেছে নেয়। আর সেই জন্য যদি সে

শাস্তি ভোগ করে, তার জন্য তো আল্লাহ্ দায়ী নন। বরং বান্দা সেই আ'মলের জন্য নিজেই দায়ী। সুরা বাকারায় মহান আল্লাহ্ বলেন-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ-

আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজের বোঝা দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। সুতরাং এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য যেন সে নিজে নিজেকেই তিরস্কার করে, ভৎসনা করে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে মহান আল্লাহর্ মহত্ব এবং বড়ত্ব সম্পর্কে হাদীসের ব্যাখ্যা পেশ করলাম। তা থেকে আমাদের জন্য যে সব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা হলো ঃ-

✪ একে অপরের প্রতি যুলুম বা অত্যাচার করা থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ্ নিজের জন্য এবং বান্দাদের জন্য যুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছেন।

✪ হেদায়াত বা সঠিক পথ দেখানোর মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এই জন্য হেদায়াত লাভের জন্য আল্লাহ্র কাছেই দোআ করা এবং তার উপর টিকে থাকার জন্য তাঁরই সাহায্য কামনা করা।

✪ আমাদের রেজেক বা জীবিকার মালিক হলেন মহান আল্লাহ্ তাআলা। সুতরাং ক্ষুধা নিবারণের জন্য মানুষের কাছে হাত না বাড়িয়ে আল্লাহ্র কাছেই রুজির জন্য দোআ করা। আর দোআর সাথে সাথে নিজেও চেষ্টা সাধনা করা।

✪ আমাদের ইজ্জত-আব্রু ঢাকা এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার কাছেই পোষাক চাওয়া। অর্থাৎ পোষাক সংগ্রহের জন্য যে সামর্থের প্রয়োজন সেই সামর্থ চাওয়া। আর সেই সামর্থ অর্জনের জন্য আল্লাহ্র কাছে যেমন সাহায্য চাওয়া এবং নিজেও চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা।

✪ মানুষের পাপ মোচনকারী একমাত্র আল্লাহ্ তাআ'লা। সুতরাং মানুষ যে প্রতিনিয়ত পাপ করে যাচ্ছে তার জন্য আল্লাহ্র কাছেই ক্ষমা চাওয়া এবং পাপ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য চাওয়া ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

✪ আল্লাহ্‌র লাভ-ক্ষতি করার বান্দার কোনো ক্ষমতা নেই। লাভ-ক্ষতি যা হয় তা মানুষেরই। সুতরাং নিজেকে সদাসর্বদা ক্ষতি থেকে বেঁচে লাভবান হবার জন্য চেষ্টা করা।

✪ আল্লাহ্‌র সাম্রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধি নয়, বরং দুনিয়া এবং আখেরাতে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্‌কে সদাসর্বদা হৃদয়-মন দিয়ে ভয় করা। আল্লাহ্‌ভীরু হৃদয়ের অধিকারী হয়ে মুত্তাকী হয়ে যাওয়া।

✪ আল্লাহ্‌র সাম্রাজ্যের কোনো ক্ষতি নয় বরং নিজের মহা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পাপাচার থেকে দূরে থাকা। হৃদয় মন দিয়ে পাপিষ্ঠ কাজকে ঘৃণা করা।

✪ আল্লাহ্‌র ধন ভান্ডার অনেক বড় বিশাল এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। এই জন্য হতাশ না হয়ে সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র কাছেই নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য দোয়া করা।

✪ আমাদের নেক ও কল্যাণকর আ'মল বা কার্যক্রমের জন্য নিজের বড়াই না করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা এবং তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর নিজের পাপ ও অকল্যাণকর কাজের পরিণতির জন্য আল্লাহ্‌কে দোষারোপ না করে নিজে নিজেকেই দোষারোপ করা এবং তিরস্কার করা।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত বিশাল এই হাদীসের দারস দিতে গিয়ে যদি আমার অজান্তে বা অজ্ঞাতে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই হাদীসে যেসব শিক্ষনীয় রয়েছে তা যেন আমরা বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি।

নয়

মানুষ মানুষের কোনো উপকার এবং ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সকল ক্ষমতা আল্লাহ্‌র

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ يَا غُلَامُ! اِنِّىْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ، اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ، وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ -(تِرْمِذِىْ)

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ একদিন আমি এক সওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পেছনে বসা ছিলাম। তিনি (আমাকে) বললেন ঃ হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটা (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয় অবহিত করছি। (তাহলো) তুমি আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধের হেফাযত করবে, (তাহলে) আল্লাহ্ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি লক্ষ্য রাখবে, (তাহলে) আল্লাহ্‌কে কাছে পাবে। তোমার কোনো কিছু চাইতে হলে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে। আর যে কোনো ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই করবে। জেনে

রেখ, গোটা জাতিও যদি তোমার কল্যাণ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে কেবল ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ্ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। পক্ষান্তরে গোটা জাতিও যদি তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে কেবল ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ্ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজগুলোও শুকিয়ে গেছে। (তিরমিযী)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ -থেকে বা হতে। اِبْنِ -ছেলে। قَالَ- -বলেন বা বলেছেন। كُنْتُ -আমি ছিলাম। خَلْفَ- (সওয়ারীর) পেছনে। يَوْمًا- -একদিন বা একদা। يَا -হে বা ওহে! غُلَامٌ-বৎস বা বালক। اِنِّىْ-নিশ্চয় আমি। اُعَلِّمُكَ-তোমাকে অবহিত করছি। كَلِمَاتٍ-কথা বা বিষয়। -اِحْفَظِ اللّٰهَ -আল্লাহ্ হেফাযত করবে। يَحْفَظْكَ-তোমাকে হেফাযত করা হবে। تَجِدْهُ-তাকে লক্ষ্য রাখবে। تُجَاهَكَ-তুমি তাকে কাছে পাবে। اِذَا سَأَلْتَ -যখন তুমি চাইবে। فَاسْأَلِ اللّٰهَ-অতঃপর আল্লাহ্র কাছেই চাইবে। وَ-এবং। اِذَا-যখন। اِسْتَعَنْتَ-সাহায্য প্রার্থনা করবে। فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ -অতঃপর আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো। وَاعْلَمْ-এবং জেনে রেখ। اَلْاُمَّةُ-গোটা জাতি। لَوْ-যদি। -اِجْتَمَعَتْ- -একত্রিত হয়। عَلٰى-উপর। يَنْفَعُوْكَ-তোমার কল্যাণ করার। بِشَيْئٍ -কোনো কিছু। لَمْ-পারবে না। اِلَّا-ছাড়া, ব্যতীত। كَتَبَهُ اللّٰهُ- -আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন। لَكَ-তোমার জন্য। يَضُرُّوْكَ-তোমার ক্ষতি করার। لَمْ يَضُرُّوْكَ -তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। عَلَيْكَ-তোমার উপর। رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ-কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। جَفَّتِ الصُّحُفُ -লিখিত কাগজও শুকিয়ে গেছে।

সম্বোধন ঃ দারসে হাদীস অনুষ্ঠানে প্রিয় ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/ বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে হাদীসের দারস পেশ করার জন্য হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ হাদীস পাঠ ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহপাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে হাদীসটার সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তাওফীক দান করেন।

রাবী বা বর্ণনা কারীর পরিচয় ঃ নাম– আব্দুল্লাহ্। কুনিয়াত– আবুল আব্বাস। পিতার নাম– আব্বাস। মাতার নাম– উম্মুল ফাযল লুবাবা। আব্দুল্লাহ্ কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ)তাঁর আপন খালা ছিলেন।

জন্ম–হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হিজরাতের তিন বছর পূর্বে শিয়াবে আবী তালিবে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল (সাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ১৩ বছর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যখন (শিয়াবে আবু তালিবে) ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাঁর মা তাকে কোলে করে প্রথমে রাসূল (সাঃ) এর কাছে নিয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) নিজের পবিত্র মুখ থেকে একটু থুথু নিয়ে শিশু আব্দুল্লাহ্‌র মুখে দিয়ে তাঁর তাহ্‌নীক করেন। এভাবে তার পেটে পার্থিব কোনো বস্তু প্রবেশ করার আগেই রাসূলের পবিত্র ও কল্যাণময় থুথু প্রবেশ করে। আর সেই সাথে প্রবেশ করে তাক্‌ওয়া ও হিকমত।

সাত বছর থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সেবা ও খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। অজুর প্রয়োজন হলে তিনি পানির ব্যবস্থা করেন, নামাযে দাঁড়ালে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সফরে গেলে তিনি তাঁর সওয়ারীর পেছনে বসে তাঁর সফরসঙ্গী হতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ রাসূলের জীবনের যে অধ্যায়ে সাহচর্য লাভ করেন তখন ছিল তাঁর খেলাধুলার সময়।

উম্মুল মুমেনিন হযরত মায়মুনা হযরত আব্দুল্লাহর আপন খালা হওয়ার কারণে তিনি অধিকাংশ সময় তাঁর কাছেই কাটাতেন। অনেক সময় তার ঘরেই ঘুমিয়ে পড়তেন। এ কারণে খুব নিকট থেকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাহচর্য লাভ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ অত্যন্ত জ্ঞানী-গুনী, হিকমত এবং কৌশলে পারদর্শী ছিলেন। রাসূলের বিভিন্ন মজলিসে বড় বড় সাহাবীদের সাথেও তিনি বসার সুযোগ পেতেন। রাসূলের সাহাবী এবং বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ছোট বয়সের।

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) ৬৮ হিজরীতে ৬৮৬/৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তায়েফ নগরে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭১ বছর। তায়েফ নগরে মসজিদে ইবনে আব্বাস নামক বিশাল মসজিদের পিছনের দিকেই তাঁর কবর দেয়া হয়।

রাসূলের ওফাতের সময় হযরত আব্দুল্লাহ্ মাত্র ১৩ বছরের কিশোর হওয়ার পরও তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রায় ১০৬৬টা হাদীস বর্ণনা করেন। যার অধিকাংশ হাদীস সহীহ্ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটা বর্ণনার সময়কাল ঃ হাদীসটা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবনের কোন অংশে বর্ণিত হয়েছে তার নির্দিষ্ট কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখলে মনে হয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসটা মাদানী জিন্দেগীতে বর্ণনা করেছেন। এখানে হযরত ইবনে আব্বাসকে যে সব উপদেশ দিচ্ছিলেন তার মধ্যে একটা হলো আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের হেফাজত। আর আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ মাদানী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিলো–মাক্কী জীবনে নয়। তাছাড়া রাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস মক্কী জীবনে শিশু ছিলেন। সুতরাং এসব বিষয় থেকে ধরে নেয়া যায়, হাদীসটা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাদানী জীবনেই বর্ণনা করেছিলেন। তারপরেও আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।

বর্ণিত হাদীসের কেতাবের পরিচয় ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর এই গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটা যেই কেতাবে স্থান পেয়েছে তা হলো 'সিহাহ্ সিত্তা' ভুক্ত কেতাব তিরমিযী শরীফে। ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসের কেতাবের মধ্যে তিরমিযী শরীফের স্থান তৃতীয়। সুতরাং ধরে নেয়া যায় হাদীসটা সহীহ্ বিশুদ্ধ।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারসের জন্য হাদীস পাঠ, তরজমা এবং কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরা হলো। এখন আমি আপনাদের সামনে উল্লেখিত হাদীসটার ব্যাখ্যা পেশ করছি।

একবার বালক আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সফরে সওয়ারীর পেছনে বসা ছিলেন। এই অবস্থায় রাসূল (সাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই

বালক আব্দুল্লাহ্কে সম্বোধন করে বললেন, হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা বা উপদেশ অবহিত করছি। যা তুমি যেমন নিজে আ'মল করবে তেমনি তোমার মাধ্যমে গোটা উম্মাতে মুহাম্মদী জেনে তা বাস্তব জীবনে আ'মল করবে। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) কোনো হাদীস বা উপদেশ উপস্থিত কোনো একজন বা একাধিক সাহাবার উদ্দেশ্যে বললেও তিনি তাদের মাধ্যমে তাঁর গোটা উম্মাতের জন্যেই বলে থাকেন। কেননা তিনি সর্বশেষ এবং বিশ্ব নবী ছিলেন। আর আল্লাহ্ তাআলাও তাকে গোটা মুসলিম জাতির জন্য অনসরণীয় আদর্শ হিসেবে পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ **তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে।** সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্র হাদীসের দ্বারা ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উম্মতে মুহাম্মদীকে অবহিত করতে চেয়েছেন। আর সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো ঃ

اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ। **তুমি আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের হেফাজত করবে, (তাহলে) আল্লাহ্ তোমাকে হেফাজত করবেন।** অত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রথম যে উপদেশ ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে গোটা উম্মতকে দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বলা হয়েছে তুমি আল্লাহ্কে হেফাজত করবে অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের হেফাজত বা সংরক্ষণ করবে। তাহলে আল্লাহ্ও তোমাকে হেফাজত করবেন।

আসলে তো আল্লাহ্পাক মানুষকে দুনিয়াতে মহান দায়িত্ব দিয়ে খলিফা হিসেবে পাঠিয়েছেন। খলিফা বা প্রতিনিধির দায়িত্ব হলো আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ নিজে মেনে চলা এবং অন্যদেরকে তা মানার জন্য সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে বাস্তবায়ন করা। যদি কেউ আল্লাহ্র যাবতীয় নির্দেশ বা বিধি-বিধানকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত বা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলেই আল্লাহ্র বিধি-বিধানের হেফাজত বা সংরক্ষণ করা হলো। শুধু আল্লাহ্র আদেশ মান্য নয় বরং তিনি যা নিষেধ বা হারাম করেছেন তা নিজে বর্জন করা এবং খলিফা হিসেবে সামাজিক ভাবেও বর্জন করার চেষ্টা করা। তা হলেই আল্লাহ্কে তথা আল্লাহ্র বিধি-নিষেধকে সংরক্ষণ বা হেফাজত করা হলো। সুতরাং যে বা যারা আল্লাহ্র আদেশ এবং নিষেধকে এভাবে হেফাজত

বা সংরক্ষণ করবে, আল্লাহ্ তাআ'লাও তার প্রতিদান হিসেবে তাকে বা তাদেরকেও হেফাজত করবেন।

আল্লাহ্ যে বিনিময় বা প্রতিদানের কথা বলেছেন, তাতো বান্দার জন্য বড় এক নিয়ামত, বড় এক পাওনা। তার কারণ আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বান্দার বিনিময় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ মোটেই ত্রুটি করেন না। কেননা তিনি যা ওয়াদা করেন তা পুরোপুরি ভাবেই পূর্ণ করেন। সূরা তাওবার ১১১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ **আর আল্লাহ্র চেয়ে কে বেশী ওয়াদা পূরণ করতে পারে ?**

হাদীসে বিনিময় হিসেবে يَحْفَظْكَ **তোমাকে সংরক্ষণ করা হবে,** বলতে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতেই হেফাজত করা হবে। দুনিয়ায় হেফাজত করা হবে অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ হেফাজত করা হলে সমাজে কোনো অন্যায়-অপকর্ম, পাপাচার থাকবে না। সকল মানুষই ঈমানদার সৎকর্মশীল এবং খোদাভীরু হয়ে যাবে। ফলে মানুষে মানুষে হানা-হানি হয়ে যেমন নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, তেমনি আল্লাহ্পাকও এই আ'মলের কারণে তাদের উপর রহমত ও বরকত অর্থাৎ শান্তি বর্ষণ করবেন। দুনিয়ার গযব আযাব থেকে রক্ষা করবেন। মহান আল্লাহ্ বলেন

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

আর যদি কোনো জনপদের লোকেরা ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করে, (তাহলে) অবশ্যই আমি সেই জনপদের জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত রহমত ও বরকতের দরওয়াজা সমূহ খুলে দেবো।

অপর পক্ষে আল্লাহ্ তাআ'লার বিধি-নিষেধ হেফাজতের জন্য আখেরাতেও তাকে হেফাজত করবেন। অর্থাৎ কবরের আযাব থেকে হেফাজত করবেন। কেয়ামতের ভয়াবহতা ও হাশরের ময়দানের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করবেন। সর্বপরী জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করে চিরস্থায়ী বসবাসের স্থান

জান্নাত দান করে হেফাজত করবেন। কেননা দুনিয়ায় যারা সকল ক্ষেত্রে সব কিছুকে উপেক্ষা করে আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ মান্য করে চলে আল্লাহ্‌ তো কেবল তাদেরকেই আখেরাতের স্থায়ী নিবাস জান্নাত দান করবেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হাদীসের পরবর্তী অংশে ইবনে আব্বাসকে বলেন ঃ -

اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ **তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি লক্ষ্য রাখবে, (তাহলে) তুমি আল্লাহ্‌কে কাছে পাবে।**

এখানে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মাধ্যমে দুনিয়ার মুসলিম জাতিকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) দ্বিতীয় যে উপদেশ দিচ্ছেন তাহলো, তুমি বা তোমরা সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রতি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং হক বা অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখবে।

বান্দার প্রতিটা এবাদত-বন্দেগী হবে একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআ'লার সন্তুষ্টির জন্যে, রাজি-খুশির জন্যে। অন্য কোনো ব্যক্তি বা সত্তার সন্তুষ্টির জন্যে নয়। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ নিজেই বান্দাকে জানিয়ে দিয়েছেন—

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(বলো) নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ একমাত্র বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌ তাআ'লার জন্য। (আনয়াম—১৬২)

সুতরাং প্রতিটা এবাদত-বন্দেগী করার সময় একমাত্র আল্লাহ্‌রই সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র হক বা অধিকারের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে।

আল্লাহ্‌র হক বা অধিকার হলো আল্লাহ্‌র জাত, আল্লাহ্‌র সিফাত এবং তাঁর ক্ষমতার সাথে কাউকে শরীক না করা। কোনো কিছুকে সমকক্ষ না বানানো।

আল্লাহ্‌র হক বা অধিকারের কথা হযরত মু'আজ (রাঃ) বুঝাতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا—

বান্দার কাছে আল্লাহ্‌র হক বা অধিকার হলো এই, তারা এমন ভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করবে যে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (বুখারী মুসলিম)

যদি কেউ আল্লাহ্‌র প্রতি অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টি এবং অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌কে কাছে পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ তখন সেই বান্দার কাছের এবং নিকটের হয়ে যাবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ এসব বান্দাদের দুনিয়ায় যেসব অনিষ্ট এবং পাপের কাজ আছে তা থেকে তাকে হেফাজত করবেন, দূরে রাখবেন। অপরপক্ষে পরকালীন জীবনেও যতো প্রকার অনিষ্ট এবং বিপদ আছে তা থেকে রক্ষা করবেন, যেমন কবর এবং কিয়ামতের আযাব থেকে রক্ষা করবেন, হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা থেকে হেফাজত করবেন, বিচারের দিনের হেসাব সহজ করে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করে জান্নাত দান করবেন। কেননা আল্লাহ্‌র হক আদায়ের কারণে এটা বান্দার হক বা পাওনা হয়ে যায়। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) হযরত মু'আজকে বান্দার অধিকারের কথা উল্লেখ করে বলেন–

وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

আর আল্লাহ্‌র উপরে বান্দার হক বা অধিকার হলো এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, তিনি তাকে (জাহান্নামের) শাস্তি দেবেন না। (বুখারী মুসলিম)।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

وَاِذَا سَاَلْتَ فَاسْاَلِ اللّٰهِ **যখন তুমি কোনো কিছু চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে।**

বালক ইবনে আব্বাসকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ কথা বা উপদেশ দিচ্ছেন তা হলো, পার্থিব এবং পারলৌকিক কোনো কিছু চাইতে হলে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে। কেননা মানুষের দুনিয়ায় চাওয়া-পাওয়ার যা আছে তা আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। চাইতে হলে তাঁর কাছেই চাইতে হবে। কোনো মানুষ বা অন্য কারো কাছে চাওয়া যাবে না। কেননা দুনিয়ায় শান্তি এবং আখেরাতের মুক্তি একমাত্র আল্লাহ্ পাকই দিতে পারেন, কোনো মানুষ বা অন্য কোনো সত্তার

পক্ষে তা সম্ভব নয়। মানুষের রুজি-রোজগার থেকে শুরু করে যা চাওয়া-পাওয়ার আছে সব কিছুই দেয়ার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। সুতরাং চাইতে হলে একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই চাইতে হবে।

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ-এবং কোনো ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্র কাছেই প্রার্থনা করবে। এখানে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) ইবনে আব্বাস সহ গোটা উম্মতকে বলছেন, যদি কোনো কিছুর সাহায্য সহযোগীতার প্রয়োজন হয়, তাহলে আল্লাহ্র কাছেই সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা করবে, তার কাছেই ফরিয়াদ করবে, তার কাছেই হাত পাতবে। কেননা কোনো মানুষের পক্ষে মানুষের অভাব-অনটন, দুঃখ-বেদনা, বিপদ-আপদ দূর করা এবং সাহায্য সহযোগীতা করা সম্ভব নয়। এসব করার ক্ষমতাও কারো নেই। ক্ষমতা আছে একমাত্র আল্লাহ্ তাআ'লার। সুতরাং ফরিয়াদ বা প্রার্থনা করতে হলে কেবলমাত্র আল্লাহ্র কাছেই করতে হবে, অন্য কারো কাছে নয়।

কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যায় মূর্খতা এবং দুর্বল ঈমানের কারণে মানুষ যখন কোনো বিপদ-আপদে পড়ে, তখন ছুটে যায় পীরের দরবারে, খানকা শরীফে, মাজারে। চাকুরী পাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভবান হওয়া, বিবাহ-সাদী হওয়া, সন্তান লাভ করা ইত্যাদি বিষয়ে প্রার্থনার জন্য টাকা-পয়সা, খাসি, মুরগী ইত্যাদি নিয়ে ছুটে যায় মাজারে, পীরের দরবারে। এটা যে কতো বড় অপরাধ ; কতো বড় বিদআত এবং শিরক; এর পরিণতি যে কতো ভয়াবহ কেবলমাত্র তারাই জানে যারা প্রকৃত জ্ঞানী, ঈমানদার, খোদাভীরু। সুতরাং হাদীসের এই অংশের উপদেশ থেকে এটাই শিক্ষনীয় যে, কোনো কিছুর সাহায্য চাইতে বা প্রার্থনা করতে হলে একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই করতে হ'বে। এবং তাঁরই কাছে ধরণা দিতে হবে। অন্য কারো কাছে নয়।

হাদীসের পরবর্তী অংশে আল্লাহ্র রাসূল আরো উপদেশ দিয়ে ইবনে আব্বাসকে বলেন ঃ

وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ-

:যনে রেখ, গোটা জাতিও যদি তোমার উপকার বা কল্যাণ করার জন্য

ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে কেবলমাত্র ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ্ তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে গোটা উম্মাতকে অবহিত করছেন। হাদীসের মধ্যে উপরে বর্ণিত যেসব বিষয়গুলো পালনের জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে তার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা অর্জনের জন্য তিনি আল্লাহ্র একক ক্ষমতা এবং মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ এটা তোমার বা তোমাদের জানা থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ এতো অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং মানুষের ক্ষমতা এতো সীমিত যে, গোটা মানব জাতিও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার বা তোমাদের কারো কোনো উপকার বা কল্যাণ করতে চায়, তাহলে ততোটুকু পরিমাণই উপকার করতে পারবে যতোটুকু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র এখতিয়ার ছাড়া মানুষ মানুষের কোনো উপকারই করতে পারে না। এই ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। সুতরাং সাহায্য যদি চাইতেই হয় তাহলে ক্ষমতাহীন মানুষের কাছে কেন, মহান এবং একক ক্ষমতাধারী একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতে হবে, ফরিয়াদ করতে হবে, ধর্ণা ধরতে হবে।

অতঃপর মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে রাসূল বলেন ঃ

وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ-

আর গোটা জাতিও যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে কেবল ততোটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, যতোটুকু আল্লাহ্ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।

হাদীসের এই অংশে রাসূলে খোদা (সাঃ) ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে গোটা জাতিকে নির্ভয় এবং সাহস দিয়ে বলছেন যে, যদি গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের কোনো ক্ষতি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তারা তোমার ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।

এখানেও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্র একক ক্ষমতা এবং মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। যেহেতু মানুষের ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা বা এখতিয়ার নেই, তাহলে মানুষ মানুষকে কেন এতো ভয় ? মানুষের কাছে কেন

এতো তওয়াজ ? মানুষের কাছেই বা কেন এত ধর্ণা? ভয় করতে হলে কেবলমাত্র আল্লাহ্কেই করতে হবে। তওয়াজ করতে হলে একমাত্র আল্লাহ্কেই করতে হবে এবং ধর্ণা ধরতে হলে কেবলমাত্র আল্লাহ্র কাছেই ধরতে হবে। অথচ সমাজে মানুষকে দেখা যায়, দুনিয়ার ক্ষমতা, অর্থ-সম্পদ এবং অস্ত্রের দাপটের কারণে মানুষ মানুষকে দেখে ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে, এমনকি ঈমান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। অথচ আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কারো ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা নেই।

সুতরাং আল্লাহ্ যদি কারো উপকার বা কল্যাণ করতে চান তাহলে সারা দুনিয়ার মানুষও যদি ঐক্যবদ্ধভাবে ঠেকানোর চেষ্টা করে তবে তাদের পক্ষে ঠেকানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনি যদি আল্লাহ্ কারো ক্ষতি করতে চান, তাহলে গোটা দুনিয়ার মানুষও যদি ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা চালায় তাহলে তার ক্ষতি থেকে কেউ তাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।

সুতরাং মুমিন, মুসলমান, খোদাভীরু লোকদের আল্লাহ্র প্রতি এই আস্থা রাখতে হবে যে, উপকার করার মালিকও আল্লাহ্ এবং ক্ষতি বা লোকসান করার মালিকও আল্লাহ। কোনো মানুষ কিম্বা অন্য কোনো সত্তা নয়। হাদীসের সর্বশেষ অংশে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।

এখানে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে মানে মানুষের ভাগ্যে যা লিখার তা লিখা হয়ে গেছে, দ্বিতীয়বার আর কিছু লিখা হবে না। আর লিখা কাগজগুলো শুকিয়ে গেছে মানে হলো কালির সাহায্যে কাগজে মানুষের ভাগ্যে যা লিখা হয়ে গেছে তা শুকিয়ে গেছে, অর্থাৎ ভাগ্যে যা লিখা হয়ে গেছে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না, লিখিত পড়িত হয়ে গেছে।

সুতরাং মানুষের কোনো পরওয়া না করে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে সকল কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

তবে এই কথার দ্বারা এখানে কিছু বিভ্রান্ত হবার সুযোগ আছে। তা হলো অনেকে এ ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে যায় যে, ভাগ্যে যা ছিলো তা তো লিখা হয়েই গেছে তাহলে কাজ করে লাভ কি ? যা ভাগ্যে লিখা আছে তাই হবে, এই বলে তারা ঈমানচ্যুত হয়ে যায়। আসলে তো এর মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি মানুষের

ঈমান, আস্থা, ভয় এবং তায়াক্কুল বেড়ে গিয়ে পাক্কা ঈমানদার, তাকওয়াবান ও খোদাভীরু হয়ে যাবার কথা। কেননা ভাগ্যে কি লিখা আছে মানুষ তো আর জানে না। সুতরাং এই কারণেই মানুষকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করতে হবে। কেননা অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلتَّقْدِرُ لَا يَرُدُّ اِلَّا بِالدُّعَا **ভাগ্য পরিবর্তন হয় না দোআ ছাড়া।**

সুতরাং এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় দোআ'র মাধ্যমেই ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে। দোআ বলতে এতে দুটো অর্থ রয়েছে। একটা হলো চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং অপরটি হলো আল্লাহ্‌র সাহায্য। অতএব নিজের চেষ্টা এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য হলেই কেবলমাত্র ভাগ্যের পরিবর্তন হলেও হতে পারে, অন্য কোনো পথে বা পন্থায় নয়।

হাত-পা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য দোআ করলে আল্লাহ্ এসব অকর্মন্য, অলস, নির্বোধ লোকদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান না। এই হাদীস দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র এখতিয়ার ছাড়া মানুষ মানুষের উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। সুতরাং ভয় যদি কাকেও করতেই হয় তবে আল্লাহ্‌কেই করতে হবে। কোনো মানুষ কিম্বা অন্য কোনো সত্তাকে নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا بِمُصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ মুসিবত হয় না।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসের যে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো এ থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় রয়েছে তা হলো–

✪ দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে হলে আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধের হেফাজত করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সকল আদেশ নিজে মানতে হবে এবং সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় গুলোও ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

✪ আল্লাহ্‌কে কাছে পেতে হলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই কেবলমাত্র তাঁর এবাদত-বন্দেগী করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র হক আদায় অর্থাৎ শিরক থেকে দূরে থাকতে হবে।

✪ পার্থিব অথবা পারলৌকিক কোনো কিছু চাইতে হলে মানুষের কাছে নয় বরং আল্লাহ্‌র কাছেই চাইতে হবে। আল্লাহ্‌র কাছেই হাত পাততে হবে। কেননা কোনো কিছু দেবার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই।

✪ কোনো কিছু বিষয়ে বা ব্যাপারে যেমন– অভাব-অনটন থেকে মুক্ত হওয়া, বিপদ-আপদ দূর করা, রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করা এবং দুনিয়ার আর অন্যান্য যেসব বিষয়ের সমাধানের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন, তা মানুষের কাছে না বলে আল্লাহ্‌র কাছেই বলতে হবে। কেননা এসবের এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার।

✪ মানুষের উপকার এবং কল্যাণ করার মালিক হলেন আল্লাহ্ তাআলা। সুতরাং এটা জানা থাকা উচিত যে, সারা পৃথিবীর মানুষও যদি একতাবদ্ধ হয়ে উপকার করার চেষ্টা করে, তার পরেও কেউ এক চুল পরিমাণ উপকার করতে পারে না যতটুকু আল্লাহ্ তার জন্য লিখে রেখেছেন।

✪ সারা পৃথিবীর মানুষও যদি কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করে তবে ততটুকু পরিমাণই ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু তার ভাগ্যে আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন।

✪ আল্লাহ্ তাআ'লা মানুষ পয়দা করার পর প্রত্যেকের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এই কথার দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে বরং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করে ভালো এবং কল্যাণকর কাজ করা আর ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য কর্ম এবং দোআর মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা যাবে না। এটা মূর্খতার কাজ। গোমরাহীদের কাজ।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরতে গিয়ে যদি আমার অজান্তে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছেই ক্ষমা চাচ্ছি। আর এই হাদীস থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আম'ল করতে পারি সেই তাওফিক কামনা করে দারস শেষ করছি।

সমাপ্ত

স্ক্যানিং পি ডি এফ ও সম্পাদনাঃ-
আব্দুল মালিক তালুকদার
http://quransunnahralo.wordpress.com
abdulmaliktalukder@gmail.com
তারিখঃ-২১/০৮/২০১৩

بسم الله الرحمن الرحيم

তোমরা আমাকে স্মরণ কর
আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো,
এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর,
অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

সূরা আল-বাকারা : ১৫২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ

وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْٓءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ

عَلَىَّ، وَاَبُوْٓءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ط

O Allah! You are my Lord. Theres is no God besides You, You created me, and I am Your slave and with all my strength, I remain steadfast to Your promise and I beseech You to forgive me any evil I perform. I humbly affirm what You bestow upon me and I plead guilty to my sins. Forgive me. For besides You there is none to forgive me.

Sayyidul Istighfar

Shaddad bin Aus ﷺ narrates that Rasulullah ﷺ states that Sayyidul Istighfar (the most loftiest of all types of repentance), is that a servant says the above once.

রাসূলুল্লাহ্ সাঃ বলেন,' যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করে নেয়'। -বুখারী

লেখকের অন্যান্য বই

- দারসে কুরআন - ১ম খন্ড
- দারসে কুরআন - ২য় খন্ড
- নির্বাচিত বিষয়ভিত্তিক হাদীস
- বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
- 'সংকলন' (বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস) - ১ম খন্ড
- 'সংকলন' (বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস) - ২য় খন্ড
- 'সংকলন' (বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস) - ৩য় খন্ড
- ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
- ❖ দারসে হাদীস ১ম খন্ড
- ❖ কুরআন হাদীসের আলোকে পাঁচদফা কর্মসূচী



সাহাল প্রকাশনী

ডিজাইন : অঙ্কুর, খুলনা, ০১৭২৭০৮৬৮